জাতির মৌলিক সঙ্কট

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

www.pathagar.com

জাতির মৌলিক সঙ্কট

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৫৯

১ম সংস্করণ
রবিউল আউয়াল ১৪২০
আষাঢ় ১৪০৬
জুলাই ১৯৯৯

বিনিময় ঃ ৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

JATIR MOULIK SANKOT by Dr. Abdul Latif Masoom.
Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 30.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আলোর পথের দিশারী
গলাচিপা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে
আমার প্রিয় শিক্ষক
মৌলভী আবু সালেহ মোহাম্মদ নূর
করকমলে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১. বাংলাদেশে জাতীয় ঐকমত্যের সঙ্কট ১৩
২. আমাদের জাতিসত্তার বিবর্তন ২৫
৩. বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ৩৫
৪. বাংলাদেশের চলমান শিক্ষাব্যবস্থা ৫৩
৫. সংসদীয় রাজনীতিতে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা (১৯৫৪-৯৯) ৬৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

এই জাতির সঙ্কটের শেষ নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভি সি প্রফেসর মতিন চৌধুরী বলতেন, 'যেখানেই যাই সমস্যা আর সঙ্কট .....।' বাংলাদেশের অপর নামই সঙ্কট। কথাটা অপ্রিয় কিন্তু অতিরঞ্জিত নয়। আমাদের ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, পরিবার, শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতি সর্বত্র সঙ্কটের সমারোহ। তবুও কিছু সমস্যা বা সঙ্কটকে 'মৌলিক' বলে চিহ্নিত করা যায়। যেসব সমস্যা বা সঙ্কটসমূহ জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত সেগুলোকে আমরা মৌলিক বলার চেষ্টা করেছি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এসব সঙ্কটকে জাতি গঠন সঙ্কট বা Nation Building Crisis বলে অভিহিত করা হয়। এ রকম মাত্র ৫টি সমস্যা নিয়ে এই বইয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এগুলো হচ্ছে ঐকমত্যের সঙ্কট, জাতীয়তাবাদ বিতর্ক, সাংস্কৃতিক সত্তা, শিক্ষাব্যবস্থা এবং সংসদীয় রাজনীতি বিষয়ক। আমরা বিষয়াবলীকে বর্তমান সময় ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে সংযোজন ও পরিমার্জনের চেষ্টা করেছি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, এসব সঙ্কটকে আমরা মৌলিক ভাবি। জাতির আরও হাজারো সমস্যার মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশল, দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি, ভাবাদর্শের সংঘাত, জাতীয় নিরাপত্তা এবং পররাষ্ট্রনীতির মতো সংবেদনশীল বিষয়সমূহ রয়েছে। ভবিষ্যতে পাঠককে জাতীয় সঙ্কটের একটি পরিপূর্ণ চিত্র উপহার দেয়ার চেষ্টা আমাদের থাকবে।

এ গ্রন্থে গ্রথিত ৫টি নিবন্ধই জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে পঠিত এবং আলোচিত হয়েছে। পরে তা জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। আমি ঐসব প্রতিষ্ঠান ও পত্র-পত্রিকার কাছে ঋণী। এভাবে গ্রন্থনার প্রস্তাবক হচ্ছেন স্বনামধন্য লেখক ও সাংবাদিক জনাব আবুল আসাদ। অগ্রজপ্রতিম জনাব এম. মাহবুবুল হক সহায়তা দিয়েছেন। আধুনিক প্রকাশনীর সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

www.pathagar.com

পারিবারিক পর্যায়ে বইটি প্রকাশে আমার সহধর্মিনী দীনা আশ্‌রাফী সোহেলী নিরন্তর প্রেরণা দিয়েছেন। আমার স্নেহানুজ জিয়া প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে নানাভাবে শ্রম দিয়েছে। সর্বোপরি আমার একজন প্রিয় ছাত্র বইটির জন্য অনেক পরিশ্রম করেছে। সকলের জন্য আমি আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করি।

বইটি সম্পর্কে সমালোচনা ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

জুলাই-১৯৯৯

ড. আবদুল লতিফ মাসুম
সরকার ও রাজনীতি বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

বাংলাদেশে জাতীয় ঐকমত্যের সঙ্কট

একটি জাতির রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জাতীয় ঐকমত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কেতাদুরস্ত ভাষায় বলা যায়, জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় (Nation Building Process) জাতীয় ঐকমত্য (Consensus of Fundamental Issues) হচ্ছে একটি অনিবার্য মাইল ফলক। আজকালকার জনপ্রিয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Myron Weiner জাতীয় ঐকমত্যের ধারণাকে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সাথে এক করে দেখেছেন। জাতীয়তাবোধ, কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, শাসক শাসিতের নৈকট্য ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক সফলতার ফসল হচ্ছে জাতীয় ঐকমত্য। International Encyclopaedia of Social Sciences-এ জাতীয় ঐকমত্য ব্যাখ্যাত হয়েছে এভাবে ঃ সাধারণ-ভাবে সমাজের রাজনৈতিকভাবে সচেতন এক বড় অংশ যখন জাতীয় জীবনের সম্পদ, অধিকার মর্যাদা ও কর্তৃত্বের বন্টন নিয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও সচেতনভাবে কোন রকম হুমকি, বাধা বা বলপ্রয়োগ ছাড়াই একমত হন তাকেই জাতীয় ঐকমত্য বলা যায়। ডি টকভিল (De Tocqucville) তার প্রদত্ত সংজ্ঞায়ও একই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ "When a great number of men consider a great number of things ..... what they hold the same opinions upon many subjects." তখনই অর্জিত হয় জাতীয় ঐকমত্য। এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমঝোতাকে জাতীয় ঐকমত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কখনওই সমাজের জনবিচ্ছিন্ন কৃত্রিম অংশের মতামত নয়। প্রকৃত ঐকমত্য হচ্ছে বৃহত্তর সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনা আশা-আকাঙ্ক্ষার উত্তম নির্যাস।

জাতীয় ঐকমত্যকে কোন কোন লেখক General agreement in thought and feeling বলেও বর্ণনা করেছেন। Glond এবং Kohl জাতীয় ঐকমত্যকে order and disorder বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আবার Lowrence Lowell-এর মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জাতীয় ঐকমত্যকে শাসক এলিটদের বৈধতার ছাড়পত্র হিসেবেও সনাক্ত করেছেন। J. S. Mill জাতীয় ঐকমত্যের স্বপক্ষে বলেন ঃ "something permanent, not to be called in question." পাশ্চাত্যের উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় J. S. Mill-এর এই ধারণার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন বৃটেনে নির্দিষ্ট ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও লক্ষ্য, পার্লামেন্টারী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, আইনের শাসন, নিয়মিত বিরতিতে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল, প্রথার ওপর গুরুত্বারোপ ও

www.pathagar.com

এর স্বীকৃতি, সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে থাকা এসব ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে। একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, প্রেসিডেন্সিয়াল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সংবিধানের প্রাধান্য, সুপ্রীমকোর্টের বিচার বিভাগীয় নিরীক্ষা ও আইনের ভাষ্য প্রদান, ক্ষমতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, নিয়মিত বিরতিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল, সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের উপর রাজনীতিক নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যাপারে মৌল ঐকমত্য সুপ্রতিষ্ঠিত এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট ঐকমত্য নষ্ট করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল বিশ্বে পরিস্থিতি ভিন্নতর।

জাতীয় ঐকমত্য ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

উন্নয়নশীল বিশ্বে জাতীয় ঐকমত্য রীতিমত সোনার হরিণ। এসব দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জাতীয় ঐকমত্যের পরিবর্তে সংঘাত এতই তীব্র যে কখনও কখনও এদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ছে। এসব দেশগুলোতে জাতীয় ঐকমত্যের অভাবে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হচ্ছে, অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্রতর হচ্ছে এবং সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ছে। অধিকন্তু বিরোধের মাত্রা তীব্রতর এবং ঐকমত্যের মাত্রা সর্বনিম্ন হওয়ায় এসব দেশে প্রশাসনিক অবকাঠামো, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা বৈধ ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারে না এবং প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। তাই স্বাধীনতার ঊষালগ্নে একটি দেশের জন্য যা অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয় তাহলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী, চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও আংশিকভাবে বিভক্ত জনগোষ্ঠীকে একটি সমঝোতা কাঠামোর মধ্যে আনয়ন করা। তাহলে ঐ রাজনৈতিক ব্যবস্থা কাম্য স্থিতিশীলতা ও জনসমর্থিত বৈধতা লাভে সক্ষম হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব উপরোক্ত বাস্তবতাসমূহ অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেলেও তারা কার্যকর ও স্থিতিশীল জাতীয় ঐক্য অর্জনে ব্যর্থ হন এবং দেশ অনাকাঙ্ক্ষিত অসাংবিধানিক প্রক্রিয়াধীন হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীন সামরিক এলিটগণ জাতীয় ঐকমত্যের পরিপূরক কর্মসূচি গ্রহণ করলেও কার্যকর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি ও সামরিক রাজনৈতিক বৈধতা ও বৈধতার সঙ্কটের ফলে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হয়নি। জাতির সচেতন নাগরিকরা এটা ভালভাবেই অনুধাবন করছেন যে, স্বাধীনতার প্রায় তিন দশক পরেও এই জনগোষ্ঠী তাদের মৌল আদর্শ বিশ্বাস ও পরিচয়ের সংকটে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। জাতীয় মৌল নীতিমালা আজও

www.pathagar.com

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করেনি। ভ্রান্ত অতীত, অস্থির বর্তমান ও নিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য আমাদের কোন সাধারণ মূল্যায়ন নেই। আমরা দেশপ্রেমের নামে, স্বাধীনতার নামে সবাই উচ্চকিত অথচ স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ন্যূনতম দাবিগুলো পূরণে ব্যর্থ। আমাদের রাজনীতিবিদরা এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের কথা বলেন অথচ পথ ও মতের ব্যাপারে তারা অবস্থান করেন বিপরীত বৃত্তে। আমাদের অর্থনৈতিক অবকাঠামো, রাজনৈতিক পদ্ধতি, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ এবং গণতান্ত্রিক সুউজ্জল ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য আমাদের আহাজারির শেষ নেই। কিন্তু দলীয় সংকীর্ণতাবোধ দ্বারা এসব এতই জড়িত যে, একটি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণে এখনও সফল হইনি। এমনকি আমরা আমাদের জাতীয় শত্রু-মিত্র নির্ধারণে অবস্থান করছি পরস্পর বিপরীত মেরুতে। এই তীব্র মতবিরোধ, অস্পষ্টতা, চরম অবস্থা এবং রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা জাতির সমগ্র ভবিষ্যতকে অমানিশার গহীন গভীরে নিক্ষেপ করছে। তাই যথার্থ গুরুত্বের সাথে সঙ্কট নিরসনের আশাবাদ নিয়ে বিরোধের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন।

বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ

ক. জাতীয় সঙ্কট ঃ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী L. W. Pye মনে করেন একটি নতুন দেশ ও জাতির প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে সমগ্র জনগোষ্ঠীর জন্য একটি সম্মত সাধারণ জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণ। অথচ স্বাধীনতার প্রায় তিন দশকেও তা আমরা অর্জন করতে পারিনি। এই অঞ্চলের জনসাধারণ ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে নতুন মানচিত্র অর্জন করে তা একটি তাৎক্ষণিক ব্যাপার ছিল না। একশ বছরের মধ্যে এই এলাকার মন-মনন, অনুভব-অনুভূতি এবং চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে স্পষ্টত তিনটি পৃথক পৃথক জাতীয়তাবোধ কার্যকর ছিল। এই তিনটি পর্যায়কে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি ঃ

প্রথম পর্যায় ঃ ১৮৮৫-১৯০৫ ঃ কংগ্রেসের মাধ্যমে অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবোধ।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ১৯০৬-১৯৪৭ ঃ মুসলিম লীগের মাধ্যমে মুসলিম জাতীয়তাবোধ।

তৃতীয় পর্যায় ঃ ১৯৪৭-১৯৭১ ঃ আওয়ামী লীগের মাধ্যমে বাঙগালী জাতীয়তাবোধ।

এই নির্দিষ্ট তিনটি পর্যায় তিনটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাধের প্রতিনিধিত্ব করে। এগুলো হলো হিন্দু প্রভাবিত অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবোধ, ইসলাম প্রভাবিত মুসলিম জাতীয়তাবোধ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভাবিত বাঙগালী

www.pathagar.com

জাতীয়তাবোধ। ১৯৭১ সালে বাঙগালী জাতীয়তাবাদ ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুলে স্বাভাবিক নিয়মেই ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙগালী জাতীয়তাবাদ তার আবেদন হারিয়ে ফেলে। এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর স্বভাবসূলভ Action Reaction ফর্মূলা অনুযায়ী এই মানচিত্রে ইসলামী আদর্শপুষ্ট তৃতীয় ধারার জন্ম হয়। ১৯৭১ পরবর্তী শাসকগোষ্ঠী জনচিত্তের এই নতুন ধারা ও আবেদন অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। বরং তাদের (ক) ভারতপ্রীতি (খ) ধর্মনিরপেক্ষতা (গ) সাধারণ মুসলিমসুলভ লৌকিকতা বিসর্জনের নীতি জনসাধারণের মধ্যে 'মুসলিম বাংলা'র ধারণা জনপ্রিয় করে তোলে। (বিস্তারিত এবং গবেষণামূলক প্রমাণাদির জন্য দেখুন ঃ রফিউদ্দীন আহমেদ সম্পাদিত ঃ বাংলাদেশে ইসলাম। আরও দেখুন এম. আবদুল হাফিজ ও আবদুর রব খান সম্পাদিত Biiss প্রকাশিত Nation Building in Bangladesh : Retrospect and prospect গ্রন্থের এম. জি. কবির লিখিত প্রবন্ধ ঃ Post 1971 Nationalism in Bangladesh : Search For a New Identity. আরও দেখুন, একই লেখকের Journal of Contemporary Asia (1987)-তে প্রকাশিত নিবন্ধ ঃ Religion, Language and Nationalism in Bangladesh. ঐ সময়ের ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপের আরও একটি চমৎকার বিবরণের জন্য দেখুন, ব্যারিস্টার এস. এ. সিদ্দিকী লিখিত Pattern of Secularism in India and Bangladesh.

বাংলাদেশ দৃশ্যতঃ একটি Homogenious society হওয়া সত্ত্বেও শাসক এলিটদের অদূরদর্শিতা, অপরিপক্কতা এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই জাতির হাজার বছর ধরে লালিত জীবনবোধ ও বিশ্বাস বিরোধী কার্যকলাপের ফলে একটি কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টি করা হয়। L. W. Pye তার Aspects of political Development গ্রন্থে বাংলাদেশের মতো মুসলিম বিশ্বের এই ধরনের সঙ্কটকে বৈধতার সঙ্কট বলে বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ

"In the other new states the question of legitimacy is more different and it involves sentiments about what should be the underlying spirit of Government and primary goals of national efforts. For example, in some Muslim lands their is a deep desire that the state should in some fashion Reflect the spirit of Islam." জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর মৌল বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি না হওয়ায় জাতীয় ঐকমত্য তো দূরের কথা ন্যূনতম সামাজিক সমঝোতাও অর্জিত হয়নি। ফলে ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তন জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করে।

www.pathagar.com

১৯৭৫ পরবর্তী শাসকগোষ্ঠী জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙক্ষা ও বিশ্বাসের একটি সরল সমীকরণের প্রচেষ্টা চালায়। বিশেষত শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান (ক) ইসলামী ধ্যান-ধারণা (খ) ভাষার অম্লান আবেদন (গ) ভৌগোলিক বাস্তবতা (ঘ) মুক্তিযুদ্ধ (ঙ) জনতার কর্ম উদ্দীপনার সমন্বয়ে জাতীয়তাবাদের একটি তৃতীয় ধারার সৃষ্টি করেন। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত শহীদ জিয়ার মরণোত্তর নিবন্ধ ঃ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ দেখুন) শহীদ জিয়ার ঘোষিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে লেখক-গবেষকরা তৃতীয় পথ বলে বর্ণনা করেছেন। এতদসত্ত্বেও জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে জাতীয় ঐকমত্য অর্জিত হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষ শক্তির অথবা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অথবা নতুন প্রজন্মের নামে ৯৬ পরবর্তী শাসক এলিট এবং তাদের বুদ্ধিজীবী অংশ এখনও জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে ধূম্রজাল অব্যাহত রেখেছেন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া এবং তার উত্তরসূরিরা যেখানে জাতীয় ঐক্যের পথ অনুসরণ করছেন সেখানে বাঙগালী জাতীয়তাবাদীরা বিভেদকে আরও শাণিত করার, সমাজকে আরও ভাঙচুর করার অবাধ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছেন। (বাঙগালী বনাম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বিতর্কটি ভালভাবে বুঝবার জন্য দেখুন, মুস্তফা নূর-উল ইসলাম সম্পাদিত বাংলাদেশ ঃ বাঙালী (৯০) ; আরও দেখুন, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত জাতীয়তাবাদ বিতর্ক)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জনমত বা জাতীয় ঐকমত্যের ব্যারোমিটার হচ্ছে নির্বাচন। ১৯৭৫ পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে বিশেষত ১৯৯১ সালের নির্বাচনে জাতীয়তা -বাদী শক্তির বিজয় এ ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ৯৬ এ আওয়ামী লীগের বিজয়ের অন্যতম কারণ প্রকারান্তরে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ বলে রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা মনে করেন।

খ. জাতীয় মূলনীতিসমূহ ঃ ১৯৭২ সালে আমাদের সংবিধানটি যখন প্রণীত হয় তখন রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ১. জাতীয়তাবাদ ২. গণতন্ত্র ৩. ধর্মনিরপেক্ষতা ও ৪. সমাজতন্ত্রের কথা সন্নিবেশিত হয়। জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে এতদ্দেশীয় জনমত ইতোপূর্বে খানিকটা আলোচিত হয়েছে। এবার গণতন্ত্রের কথায় আসা যাক। জাতীয় ঐকমত্যের একটি মৌলিক সূত্র হচ্ছে এই ঃ যখন কোন মূলনীতি জাতি গ্রহণ করবে তখন জাতির প্রকৃত আস্থা অনুধাবন করেই তা নির্ধারিত হবে। নির্ধারণের পরে যখন তখন দল বা ব্যক্তি বিশেষের সুবিধার জন্য তা বদলানো যাবে না। ১৯৭২ সালে যারা সংবিধান প্রণয়ন করেন তারা গণতন্ত্রকে অন্যতম মৌলনীতি হিসেবেই গ্রহণ করেন। এ মৌলিক নীতি অনুযায়ী জাতির আশা-আকাঙক্ষা তথা অতীত

www.pathagar.com

সংগ্রামের আলোকে সংসদীয় রীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে শাসক এলিটরা যখন জনবিচ্ছিন্নতার প্রান্তসীমায় পৌছেন তখন নিজেদের গদির নিরাপত্তা বিধানে দেশ বা সংবিধান থেকে গণতন্ত্রকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেন। "শোষিতের গণতন্ত্রের" নামে একদলীয় একনায়কত্ববাদী শাসনের জগদ্দল পাথর জাতির উপরে চাপিয়ে দেয়া হয়। রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন যে কেউ এটা বোঝেন যে সেদিন যদি 'সাংবিধানিক ক্যু'-এর মাধ্যমে গণতন্ত্রের কবর রচিত না হতো তাহলে 'সামরিক ক্যু'টি জনসমর্থিত হতো না। এরপর আসা যাক সমাজতন্ত্রের ভাষ্যে। ১৯৭৬ সালে শহীদ জিয়াউর রহমান সমাজতন্ত্রকে সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে সংবিধানে স্থান দেন। সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ বা বর্জনের আপদ-বিপদ বিবেচনায় রেখেই সম্ভবত এ রকম সংশোধনী দেয়া হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে ভলগা থেকে গঙ্গায় অনেক পানি গড়িয়েছে। সমাজতন্ত্র হয়েছে বিশ্বব্যাপী পরিত্যাজ্য। সুতরাং সমাজতন্ত্র শব্দটি কি আর নতুন পৃথিবীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ? তবুও আমি নিশ্চিত সমাজতন্ত্র শব্দটি বাদ দেয়ার প্রশ্ন উঠলে সমাজতন্ত্রের এদেশীয় মাসীরা আহাজারিতে উচ্চকিত হবেন আর বলবেন King is dead, Long live the King.

গ. প্রশাসনের মৌলকাঠামো ঃ এই সেদিন অবধি সরকার পদ্ধতি নিয়ে আমাদের বিতর্কের শেষ ছিল না। এদেশের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের বিজয়ের ফসল হিসেবে সংসদীয় গণতন্ত্র গ্রহণ করা হয়েছে। একটি পদ্ধতি গ্রহণ করলেই তার সুফল লাভ করা যায় না। এর জন্য চাই নিঃশর্ত সমর্থন ও অনুশীলন। ৯১ এবং ৯৬ পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে না আমাদের রাজনৈতিক এলিটরা সংসদীয় পদ্ধতিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন। একটি রীতি-পদ্ধতির গ্রহণ-যোগ্যতা ও স্থিতিশীলতার জন্য সমন্বয় ও সহযোগিতা অপরিহার্য।

আমাদের প্রশাসনের মৌল পরিবর্তনের আর যে বিষয়টি আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে তাহলো উপজেলা পদ্ধতি। সরকারি দল ও বিরোধী দল এ ব্যাপারে যেমন কোন সমঝোতায় পৌছতে পারছে না তেমনি বিভক্ত জনমত। স্বাধীনতার পর পর সব মহকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তরিত করে যেমন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তুঙ্গে পৌছে দেয়া হয়েছে তেমনি করে আর একটি পদক্ষেপ ছিল থানাগুলোকে উপজেলায় পদোন্নতি প্রদান। থানা বনাম উপজেলার যোগ বিয়োগ করলে তেমন কোন ফল বেরুবে কিনা সন্দেহ থাকলেও বিকেন্দ্রীকরণের নামে যে পোশাকী উন্নয়ন ঘটেছে তা থেকে সরে আসা কোন সরকারের পক্ষে সম্ভব কি না ভেবে দেখার বিষয়। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ সরকার সংসদে একটি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছেন। তাতে 'জাতীয় ঐকমত্যের' প্রতিফলন প্রয়োজন বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন। এ ছাড়া 'গ্রাম পরিষদ' ধরনের পরিবর্তনের

www.pathagar.com

আগে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীর পুনর্মূল্যায়ন ও জাতীয় ঐকমত্য প্রয়োজন।

ঘ. উন্নয়নকৌশল (Development Strategy) ঃ একটি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে উন্নয়নকৌশল (Development Strategy) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং উন্নয়নের ধরন-ধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে জাতীয় ঐকমত্য অপরিহার্য। যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার বদল একটি রুটিন ওয়ার্ক। সুতরাং সরকার বদলের সাথে সাথে যদি গৃহীত প্রকল্প বাতিল হয়ে যায় অথবা উন্নয়নকৌশল বদলে যায় তাহলে দেশের উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হতে বাধ্য। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্রতম দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সবাইকে হতে হবে অত্যন্ত সতর্ক এবং দায়িত্বশীল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য আজও আমাদের উন্নয়ন কৌশল বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঐকমত্য অর্জিত হয়নি। উন্নয়ন কৌশল বা অর্থনীতিও এখানে দলীয়করণের শিকার। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে স্বাধীনতার প্রাথমিক বছরগুলোতে সুস্পষ্ট জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা ছাড়াই পাইকারী জাতীয়করণের ফলে শিল্প ব্যবস্থা একটা অবাধ লুটপাটের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৯৭৫ পরবর্তীকালে নতুন উন্নয়ন কৌশল গৃহীত হয়। শুরু হয় বিরাষ্ট্রীয়করণ ও ব্যক্তিমালিকানার নামে আমদানি-রফতানি, ব্যাংক ঋণ এবং শিল্প কারখানায় ব্যক্তি নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। এর ফলে সমাজে অসাম্য ও শোষণ বেড়ে একটি নব্য ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে।

সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অথবা মিশ্র অর্থব্যবস্থা এ তিন ব্যবস্থার টানাপোড়েনে আমাদের ত্রিশঙ্কু অবস্থা। চতুর্থ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামী দলগুলো ইসলামী অর্থব্যবস্থা কায়েমের কথা বলছে। রাজনৈতিক দলগুলো ব্যক্তি বনাম রাষ্ট্র, জাতীয়করণ বনাম বিরোধীকরণ, বৈদেশিক সাহায্যের কার্যকারিতা এবং সম্পদের বন্টন ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন সমঝোতা বা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের পক্ষে একমত হতে পারছে না।

ঙ. সামাজিক শক্তিসমূহের ভূমিকা ঃ আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার দু'টো অপরিহার্য অনুষঙ্গ ঃ আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনী। বেসামরিক আমলাতন্ত্র অস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত নয় বলে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে এখনও দৃশ্যতঃ অনুগত। যদিও তাদের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের সীমা পরিসীমা সম্পর্কে আমাদের রাজনৈতিক নেতারা নানা মত পোষণ করেন। বিস্ময়ের ব্যাপার রাজনৈতিক নেতারা ক্ষমতাসীন থাকলে এক মানদণ্ডে কথা বলেন, ক্ষমতাচ্যুত হলে অপর কথা বলেন। আমলাতন্ত্র প্রশ্নাতীতভাবে রাজনৈতিক সরকারের অনুগত হবে, নাকি

www.pathagar.com

প্রজাতন্ত্রের স্বার্থের রক্ষা কবচ হবে খালেদা জিয়া সরকারের পতনের আগে ও পরে এ আলোচনা বেশ জমে উঠেছিল। আজও এর মীমাংসা হয়নি। অপরদিকে, সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে মতবিরোধের শেষ নেই। সশস্ত্র বাহিনী বিগত তিন দশকের অধিকাংশ সময় ধরে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে সমাসীন থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণ তাদেরকে 'হস্তক্ষেপ করার বৈধ কর্তৃপক্ষ' মনে করে না। বরং পাশ্চাত্যের মতো এখানেও বেসামরিক কর্তৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব আশা করে। এ বিষয়টি নিয়েও সুস্পষ্ট জাতীয় ঐকমত্য প্রয়োজন।

অপরদিকে, অন্যান্য পেশাজীবি এবং শ্রমিক কর্মচারি সমিতিগুলোও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দাবীদার। এ সময়ে বাংলাদেশে পেশাজীবি তথা শ্রমিক কর্মচারি ইউনিয়নসমূহ নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে। জাতির সামগ্রিক সঙ্কট ও কল্যাণের প্রেক্ষিতে সম্মত ভূমিকা রাখার কোন প্রয়াস এসব দল ও সংগঠনগুলোতে অনুপস্থিত।

চ. জাতীয় নিরাপত্তা (National Securitv) ঃ জাতীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ নিরাপত্তা দু' ধরনের ঃ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক। জাতীয় স্বার্থ, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিপন্ন হতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক তৎপরতার বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে আমাদের সোচ্চার হতে হবে এটাই দেশপ্রেমের দাবি। জাতীয় শত্রু এবং মিত্র ঐ নিরিখেই নির্ণিত হওয়া উচিত। অথচ তা না হয়ে ঐসব নাজুক এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও রাজনৈতিক দলগুলো অস্বস্তিকর, বিব্রতকর এবং বিপজ্জনক নীতিভঙ্গি গ্রহণ করছে। বাংলাদেশ বর্তমানে আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিপদের মোকাবেলা করছে। দেশের নিরাপত্তা ও সংহতির প্রশ্ন জড়িত থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে অভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৯৮ সনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও 'শান্তি' সুদূর পরাহতই মনে হয়েছে।

ছ. পররাষ্ট্রনীতি ঃ পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বভাবতই জাতীয় স্বার্থ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে দলীয় স্বার্থ, মতবাদভিত্তিক সম্পৃক্ততা অথবা অন্যবিধ প্রসঙ্গ প্রাধান্য পাবে না। পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নির্ধারকগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের বিগত তিন দশকের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কোন সুসামঞ্জস্য নেই। প্রাথমিক বছরগুলোতে এবং এখন বাংলাদেশের আদৌ একটি স্বাধীন সার্বভৌম পররাষ্ট্রনীতি আছে কি না সে ব্যাপারে সরকারের রাজনৈতিক বিরোধীরা সন্দিহান।

জ. ধর্মীয় রাজনীতি ঃ সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ধর্মীয় রাজনীতি নিয়ে বেশ উত্তপ্ত। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক দিয়ে জনসংখ্যার

www.pathagar.com

৮৫% ভাগই মুসলমান। তবুও রাজনীতিতে ধর্মীয় আবেদন কতিপয় দলের কাছে বিপজ্জনক মনে হচ্ছে। যখন জাতীয় নিরাপত্তা ও মর্যাদা বিপন্ন হয় তখন সকল পক্ষ সরকার ও বিরোধীদলের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ব্যাপারটিকে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা। কিন্তু অতীতে বিশেষত বিদেশের মাটিতে জাতীয় নেতা-নেত্রীদের এ ব্যাপারে বিব্রতকর ও মর্যাদাহানিকর বিবৃতি দিতে দেখা গেছে। N G O বা বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর তৎপরতার সম্পর্কেও নানা মুনির নানা মত রয়েছে।

জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছার কৌশল

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিভিন্ন মত ও পথের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অনিবার্য। তাই 'যত মত তত পথ' এর পরিবর্তে একটি কমন পথ ও মতের অনুসরণ ও অনুশীলন জাতীয় স্বার্থেই অপরিহার্য। এই সাধারণ পথ ও মত অর্জিত না হলে সমাজে অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। স্থিতিশীলতা হুমকির সম্মুখীন হয়, এমনকি জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা এই যে, দলগুলো অনড়, অসহিষ্ণু, অবিশ্বাসী এবং অসহযোগিতামূলক। বিগত তিন দশকে আতাত বা ঐক্যজোট গড়েছে, ভেঙ্গেছে। স্থিতি লাভ করেনি শুধুমাত্র ঐসব প্রবণতার কারণে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিও (Political Culture) এমন সমৃদ্ধ নয় যে আমরা স্বাভাবিকভাবে জাতীয় ঐকমত্য কামনা করতে পারি। জাতীয় জীবনে সংঘাত বা ভায়োল্যান্স বা সংঘাতময় পরিস্থিতির অবসানের লক্ষ্যে জাতীয় ঐকমত্যে পৌঁছার সব কলা-কৌশলগুলোই আমাদের অনুশীলন করতে হবে।

সাম্প্রতিককালে একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাদের সমীক্ষায় জাতীয় ঐকমত্যের ৩টি সমস্যা নির্দেশ করেছে। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ঃ মাহবুবুর রহমান ও আবদুর রব খান প্রণীত নিবন্ধ ঃ বাংলাদেশ ঃ জাতীয় ঐকমত্যের সন্ধানে, Biiss Papers : 12, 1990) এগুলো হলো ঃ

ক. জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনবিচ্ছিন্নতা।

খ. মৌলিক বিষয়ে এলিটদের দ্বন্দ্ব-কলহ।

গ. একতরফা সিদ্ধান্ত।

এসব সমস্যাগুলো অতিক্রম করার জন্য যেসব প্রস্তাবনা ও সম্ভাবনা কার্যকর তাহলো ঃ

ক. নিয়মিত বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচনের ব্যবস্থা।

খ. প্রচার মাধ্যমসমূহের স্বাধীনতা।

www.pathagar.com

গ. জনমত জরিপ।

ঘ. রাজনৈতিক সংলাপ।

ঙ. রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব বা সংশ্লিষ্টতা বৃদ্ধিকরণ।

জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাচন জাতীয় ঐকমত্যকে জাতীয় পর্যায়ে আলোচিত বিতর্কিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রচার মাধ্যমসমূহ স্বাধীনতার প্রহরী হিসেবে কাজ করবে। জনমত জরিপের ফলাফল দ্বারা সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ বোঝা যাবে। রাজনৈতিক সংলাপ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নিরসনের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। আমাদের এই অঞ্চলে সংলাপ বা গোল টেবিল বৈঠকের ধারণা নতুন নয়। সংলাপ আন্তঃদলীয় পর্যায়ে হতে পারে, জাতীয় পর্যায়ে হতে পারে। সরকারি দল ও বিরোধী দলেও হতে পারে। জাতীয় ঐকমত্য অর্জনের লক্ষ্যে সংলাপ হচ্ছে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় পদক্ষেপ।

সাধারণ ঐকমত্য মানেই সাধারণ মানুষের ঐকমত্য

জাতীয় ঐকমত্যের ধারণাটি দ্ব্যর্থবোধক হতে পারে। আমরা "জাতীয় ঐকমত্য" এই প্রত্যয় দ্বারা কাদের ঐকমত্য চাই ? জাতীয় ঐকমত্য কি গঠন করার বিষয় নাকি বিশাল জনগোষ্ঠীর বিক্ষিপ্ত মতামতের মধ্য থেকে ঐকমত্যের মূল সুরটি খুঁজে নেবার বিষয়। আমরা জাতীয় ঐকমত্য দ্বারা নিশ্চয়ই শহুরে বিবৃতিজীবিদের (!) অথবা তথাকথিত প্রগতিশীলদের ঐকমত্য বুঝবো না। অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা শিক্ষিত সমাজের একতরফা চেতনাকে বুঝবো না। ঐকমত্য অবশ্যই বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশাল ক্যানভাসে গৃহীত প্রত্যয়ের ফসল। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সম্পর্কহীন সিদ্ধান্তকে জাতীয় ঐকমত্য বলে চালিয়ে নেবার দুর্ভোগ সাম্প্রতিক বিশ্বে পূর্ব ইউরোপ তথা অবলুপ্ত সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ্য করেছে। জনতার শক্তি জাতিকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে বর্তমান বিশ্বে তার প্রমাণ অসংখ্য। সত্যিকার জাতীয় ঐকমত্যে শক্তি বা চাপ প্রয়োগের কোন স্থান নেই। নেই কোন গণনিধনের বা আস্ফালনের স্থান। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মতি বা ঐকমত্যই হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার চালিকা শক্তি। "বস্তুত ঐকমত্যের রক্ষাকবচ কোন বিশেষ Regime বা সরকার প্রণীত আইন নয় বরং ব্যাপক জনগণের সমর্থনই হচ্ছে তার রক্ষাকবচ। সমাজ অভ্যন্তরস্থিত চেতনা, বিশ্বাস, মনোভাব ও উপলব্ধিই প্রকৃত জাতীয় ঐকমত্য। জাতীয় ঐকমত্য সমাজকে দান করে স্থিতি, দৃঢ়তা ও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন। ১৯৭১ সালে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকার কারণে তাদের প্রতি কোন কোন মহলের ক্ষোভ ও ক্রোধের কারণ অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তাদের ঐ ক্ষোভ ও ক্রোধের সর্বপ্লাবিতা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন তারা ঐ ক্ষোভের আড়ালে সত্যিকার ইসলামী আন্দোলনকেও

www.pathagar.com

চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছে—এটি তাদের রণকৌশল। তাদের ঐসব ধারণা এতই সংকীর্ণ যে মেজর জলিলের মত বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসলামের কথা বলে তাদের ভাষায় রাজাকার হয়ে গেছেন, মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক জিয়াউর রহমান ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি তার আনুগত্যের কারণে অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছেন। মজার ব্যাপার এই যে, ঐসব রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতিতে ধর্মকে আমদানির বিরোধিতা করলেও '৯৬-এর নির্বাচনে ধর্মীয় আবেগ থেকে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার সব কসরতই অনুশীলন করেছে। তাদের এসব স্ববিরোধী এবং সুবিধাবাদী ভূমিকার কারণে বাংলাদেশে ধর্মীয় বাস্তবতাও বিপদ মোকাবেলা করছে। বর্তমানে ধর্মের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে যে উত্তপ্ততা বিরাজ করছে তা জাতীয় জীবনে সম্ভাব্য অস্থিতিশীলতারই ইঙ্গিতবাহী।

জাতীয় ঐকমত্য ও সংসদীয় গণতন্ত্র

যে কোন সরকার পদ্ধতির চেয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রে জাতীয় ঐকমত্যের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। প্রয়োজন এই জন্য যে, ঐকমত্যই সংসদীয় গণতন্ত্রের চালিকাশক্তি। আর রাজনৈতিক দলগুলোই হচ্ছে জাতীয় ঐকমত্যের ধারক ও বাহক। লাস্কি যেমনটি বলেছেন ঃ "রাজনৈতিক দলগুলো হচ্ছে তাদের স্ব-স্ব বিশ্বাসের প্রতিভূ।" তেমনি সংসদে সমবেত দলগুলোর প্রতিনিধিমণ্ডলী অবশ্যই স্ব-স্ব দল মত আর বিশ্বাসের প্রতিনিধিত্ব করেন। এই প্রতিনিধিত্বের ধারণাটি যদি দলীয় স্বার্থ ও সংকীর্ণতার উর্ধে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কার্যকর না হয় তাহলে জাতীয় স্বার্থ ব্যাহত হতে বাধ্য। তাই জাতীয় স্বার্থেই সমঝোতা বা ঐকমত্য অনিবার্য। একটি দল বা ব্যক্তি হিসেবে আমাদের স্বার্থ এক নাও হতে পারে কিন্তু জাতীয় স্বার্থে সবাই এক ও অভিন্ন। তাছাড়া জাতীয় সংসদ দেশে এবং বিদেশে সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব করে কোন ব্যক্তি বা দলের নয়। সুতরাং তাদের সংগ্রাম, আন্দোলন, মতবিরোধ ও মতৈক্য সবই গণতন্ত্রের স্বার্থে নিবেদিত। জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে যদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত না হয়, বাজেট প্রণীত না হয়, পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত না হয় তাহলে আগামী দিনের সম্ভাব্য পরিবর্তনের সাথে সাথে সবকিছুই পরিবর্তিত হবে। এর ফলে Continuity ব্যাহত হবে, জাতীয় স্বার্থ বিপন্ন হবে। সংসদে বিরোধী দল জাতীয় স্বার্থেরই প্রহরী। সংসদীয় রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী Her Majesty's Loyal Opposition হচ্ছে আর একটি ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভা। যাদেরকে ছায়া মন্ত্রীসভা (Shadow Cabinet) বলা হয়। যে কোন সময়ে সরকারের পতন ঘটলে তাদেরকেই সরকারের দায়িত্ব বহন করতে হয়। সুতরাং তারাও তাদের আচরণে কার্যপদ্ধতিতে দায়িত্বশীল হয়ে থাকেন। তারা বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা করেন না। জাতীয়তা, জাতীয় মৌলনীতিমালা, প্রতিরক্ষা,

www.pathagar.com

পররাষ্ট্র ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ে সাধারণ সম্মতিতেই সমগ্র রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিকল্পিত হওয়া উচিত। বিশেষত যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে বর্তমান সংসদীয় রীতিপদ্ধতি কার্যকর রয়েছে সে ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধীদলের ঐকমত্য তথা জাতীয় ঐকমত্য অর্জিত না হলে উভয় পক্ষকেই জাতির সামনে অচিরেই জবাবদিহি করতে হবে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত 'ঐকমত্যের সরকার' প্রতিষ্ঠিত হলেই জাতীয় ঐকমত্য অর্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই। জাতীয় ঐকমত্য অতি অবশ্যই জনতার বিশ্বাস ও কর্মের ঐক্যসূত্র।

---

www.pathagar.com

আমাদের জাতিসত্তার বিবর্তন

ক. ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনময় ধারা চির প্রবহমান। আমাদের এই জাগতিক লোকালয়ের কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা ইতিহাসের ঐ প্রবহমান ধারার মাঝে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথিবীর এই অঞ্চলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ইতিহাসের সেই প্রবহমান ধারারই একটি অনিবার্য পরিণতি। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে অদ্যাবধি ইতিহাসের নিরন্তর ঘটনাপ্রবাহ এই বর্তমানকে নির্মাণ করেছে। তাই ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে গাঙ্গেয় অববাহিকায় ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বিজয় আর ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় একটি সুদীর্ঘ নদীর উৎস আর মোহনার পরিণতি। বহমান সেই নদীর অসংখ্য বাঁকে এসেছে অনেক ভাঙন, এসেছে অনেক প্লাবন, তবুও নদীর গতি থেমে থাকেনি। স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক পথে নদী তার অভীষ্ঠ গন্তব্য 'মিলন মোহনায়' পৌঁছেছে। বাংলাদেশী এই শঙ্কর জনগোষ্ঠীও হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্যকে লালন করে অবশেষে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জনের মধ্য দিয়ে ইপ্সিত জাতিসত্তা ধারণ করেছে।

খ. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতিসত্তার পরিপূর্ণতার মাইল ফলক। এই বিজয়ই ২৩ বছরের 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ',[১] (Internal Colonialism)-কে অতিক্রম করে আমাদের স্বাতন্ত্র্য, আমাদের সার্বভৌমত্বকে প্রমাণিত করেছে। 'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে' এই ছোট্ট ভূখণ্ডটির বিপুল জনগোষ্ঠী আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। স্বকীয় স্বাধীনতা, জাতীয় আদর্শ, শাশ্বত বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে সামগ্রিকভাবে অনুসরণ এবং অনুশীলনের প্রকৃষ্ট সুযোগ এনে দিয়েছে এই কষ্টার্জিত বিজয়। উন্নয়ন সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রার সৌধ নির্মাণের জন্য অর্জিত স্বাধীনতা একটি সোনার চাবিকাঠি।

তাই স্বাধীনতা আমাদের কাছে আত্মবিশ্লেষণ আর আত্মানুসন্ধানের বিবেকময় অভিধা। স্বাধীনতার তিন দশক পরে তাই সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করা যায়, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শিক লক্ষ্য, জাগতিক উন্নয়ন ও দেশবাসীর মৌলিক অধিকার[২] নিশ্চিত করার জন্য আমাদের অর্জিত অগ্রগতি কতটুকু ? আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, সরকারের অঙ্গ সংগঠনসমূহ (Executive, Judiciary and Bureaucracy) এই জাতির আত্মজাগৃতির জন্য কি অবদান রেখেছে স্বাধীনতা সেই জবাবদিহিতা (Accountability) নিশ্চিত করার বাহন। একটি জাতির জীবনে স্বাধীনতার আনন্দ ও গর্ব স্থায়ী হয় তখনই যখন তাহার পুঞ্জীভূত বেদনা ও অশ্রু তাহার

www.pathagar.com

স্নেহ কোমল হাতে মুছিয়া দিয়া নতুন এক মূল্যবোধ ও চেতনা তাহাকে উজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করে।[৩]

গ. এ জাতির ভৌগোলিক পরিচয় নির্ণিত হয়েছে। জাতিসত্তার অবয়ব নির্মিত হয়েছে। কিন্তু সঙ্কট দূরীভূত হয়নি। প্রকৃত মুক্তি অর্জিত হয়নি। আমাদের জাতীয় জীবনের বিলীয়মান আড়াই যুগের খতিয়ান কষলেই এই সত্যতা প্রমাণিত হবে। যে শোষণমুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যময় নিরাপদ জীবনের জন্য ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জনগণ জীবনকে বাজি রেখেছিল বিজয়ের দ্বিতীয় বার্ষিকী পালন করতে না করতেই সেই জনগণ হতাশার অতল গভীরে নিমজ্জিত হয়। একজন ব্যক্তি মানুষের জীবনকে যেমন দু'ভাবে দেখা যায় নৈতিক ও জাগতিক ভাবে একটি জাতির জীবনকে সেভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ আদর্শিক ও অর্থনৈতিকভাবে। এ জাতির দুর্ভাগ্য যে বিজয়ের প্রাথমিক বছরগুলোতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব যাদের হাতে বর্তায় তারা জাতির ঐ দ্বিবিধ দিশা দিতে ব্যর্থ হয়। কিভাবে একটি আদর্শভিত্তিক জনজীবনকে ভিন্নমুখী করার চেষ্টা করা হয়েছে অথবা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও জীবনবোধের উপর উদ্দেশ্যমূলকভাবে আঘাত করা হয়েছে সমাজবিজ্ঞানীরা তা বিশ্লেষণ করেছেন।[৪] কিন্তু জনগণের বৈষয়িক তথা অর্থনৈতিক জীবন যে কিভাবে বিপর্যস্ত এবং দুঃসহ ছিল তা গবেষণার অপেক্ষা রাখে না। শাসক এলিটদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলপ্রীতি, নিপীড়ন-নির্যাতন এবং অযোগ্যতা সকল সীমারেখা লংঘন করে। রাজনৈতিক প্রথা প্রতিষ্ঠানের প্রতি ন্যূনতম আনুগত্য প্রদর্শনেও শাসককূল ব্যর্থ হয়।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ঘটে। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বদলে প্রতিষ্ঠিত হয় সামরিক কর্তৃত্ব। সৈনিক রাজনৈতিক জিয়াউর রহমান কতিপয় বিধি-ব্যবস্থা দ্বারা ইতোপূর্বের রাজনৈতিক ক্ষতি উপশমের চেষ্টা করেন। জাতীয় মূলনীতি, সংবিধান ও সরকারি কর্মকাণ্ডে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। ঐক্যের রাজনীতি, উন্নয়নের আহ্বান ও ব্যক্তিগত সততা নিষ্ঠার উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শীঘ্রই তিনি (ক) বিদেশী চক্রান্ত (খ) সামরিক বাহিনীর বৈশিষ্ট্যগত দুর্বলতা ও (গ) মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত রক্ষকদের হাতে নিহত হন।[৫] জিয়াউর রহমানের মৃত্যু রাজনৈতিক এলিটদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার একটি সুযোগ সৃষ্টি করে। কিন্তু পক্ষ ও বিপক্ষের রাজনৈতিক এলিটদের (ক) ষড়যন্ত্র (খ) নেতৃত্বহীনতা (গ) অযোগ্যতা (ঘ) দুর্নীতি (ঙ) ব্যক্তিত্বের সংঘাত (চ) অভ্যন্তরীণ কোন্দল (ছ) প্ররোচনা (জ) নীরব সমর্থন সামরিক বাহিনীকে আবারও ক্ষমতার প্রতি প্রলুব্ধ করে। ফলে দেশটি আবার সামরিক স্বৈরাচারের নিগড়ে বন্দী হয়ে পড়ে। পৃথিবীর আর সব সামরিক কর্তৃত্বের মতোই লেঃ জেনারেল এরশাদ জোয়ার

www.pathagar.com

দেখে পাল তোলার নীতি অনুসরণ করেন। প্রায় এক দশক ধরে শুধুমাত্র (ক) রাজনৈতিক ব্লাক মেইলিং (খ) নীতি গর্হিত সুবিধাদান (গ) রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রতারণা ইত্যাদি উপায়ে তিনি কর্তৃত্বে আসীন থাকেন।

সরকারের ব্লাক মেইলিং এবং বিরোধীদলের অনৈক্য জনগণকে প্রাথমিক পর্যায়ে হতাশ ও রাজনীতি নিরাসক্ত করে তোলে। পরবর্তীকালে ছাত্র-জনতা ও পেশাজীবিদের আন্দোলনের মাধ্যমে সামরিক স্বৈরাচারী অপসারিত হলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত বিএনপি জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

ঘ. বিগত দু' যুগের খতিয়ান থেকে আমাদের প্রশাসনিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা পাওয়া যেতে পারে। বর্তমান (১৯৯৯) গণতান্ত্রিক সরকারের অতিক্রান্ত তিন বছর থেকেও সমীক্ষা নেয়া যেতে পারে। অতীতের পর্যালোচনা আর বর্তমানকে ভিত্তি করেই রচিত হবে ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশের জনজীবন এবং প্রমাণপঞ্জি থেকে আঁকা যেতে পারে একটি ভবিষ্যৎ রূপকল্প। এই রূপকল্প আঁকতে গিয়েও আমরা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে দু' ভাগে দেখবো। প্রথমত জাগতিকভাবে এবং পরে আদর্শিকভাবে।

ঙ. "বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখন বসে, বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজি কুরআন-হাদীস চষে।" মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে কবি নজরুলের এই খেদোক্তি বাংলাদেশের বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য। বিগত দু' যুগ ধরে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি তো দূরের কথা আমরা দারিদ্র ও শোষণ থেকে আজও মুক্তি পাইনি। অথচ বিগত তিন দশকে আমাদের এশিয়া ভূখণ্ডেরই কোন কোন দেশে বিস্ময়কর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ১৯৬২ সালে সিঙ্গাপুরের মাথাপিছু আয় ছিল ৮০০ মার্কিন ডলার, ১৯৯৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৩১০ মার্কিন ডলার। ঐ একই সময়ে হংকং ছিল ৯০০ ডলার এর কোটায়। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৩২০। তাইওয়ান এ ব্যাপারে সবার উপরে অর্থাৎ একই সময়ে ৭০০ থেকে ৮০০০ মার্কিন ডলারে তার উত্থান। পাকিস্তান বা থাইল্যাণ্ড অতি সাম্প্রতিক-কালে বেশ উন্নতি করেছে। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের অবস্থান ছিল ৭০ ডলার আর থাইল্যাণ্ড ৭৫ ডলার। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এদের আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০০-এর কোটায়।[৬] অথচ এখনও বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৩০ ডলার এর বেশি নয়। জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার ০.৮% মাত্র। স্বাধীনতার প্রায় তিন দশক

www.pathagar.com

অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি। ভুটান, সোমালিয়া ও ইথিওপিয়ার পরেই বাংলাদেশের অবস্থান। অতীতে যে বাংলাদেশ Bottomless Basket বলে অবহিত হয়েছে এখনও অবস্থার তেমন কোন হেরফের ঘটেনি। আমরা 'নূন আনতে পান্তা ফুরায়' অর্থনীতিতে অবস্থান করছি। 'উন্নয়ন কৌশল' বা 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' সম্পর্কে আজও আমাদের কোন সম্যক কর্মবিধি নেই। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সম্মত এবং সমন্বিত একটি কৌশল এবং পরিকল্পনা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন। কোন ক্ষেত্রেই সেই বহুল কথিত জাতীয় ঐকমত্য বা National Cousensus প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নিকট ভবিষ্যতে এই অবস্থার কোন পরিবর্তনের কোন লক্ষণ নেই। আমাদের রাজনৈতিক নিগড়ে অর্থনীতি বিপদগ্রস্ত।

যে কৃষিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার কাম্য সেখানে কৃষক তাঁর ন্যায্য দ্রব্যমূল্য পাচ্ছে না। এ বছর ধানের আশাতীত ফলনের কথা বলা হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়ার কারণে উৎপাদিত খাদ্যশস্যের মূল্য এতই কমে গেছে যে, কৃষক এক মণ ধান বিক্রি করে একটি শাড়ী কিনতে পারছে না। সরকারি ক্রয় নীতিতে কৃষককে সুবিধাদানের পরিবর্তে উৎপাদন বিশ্লিষ্ট এক ধরনের মুৎসুদ্ধি তোষণের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারসাম্যহীন পরিবার-পরিকল্পনার নামে সমৃদ্ধ এবং দক্ষ জনসংখ্যার ঘাটতির দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকও এ বিপদ সম্পর্কে একযুগ আগে জাতিকে সতর্ক করেছেন।[৭] আমাদের নীতিমালা ও কার্যক্রম মেধাবী জনশক্তিকে ধরে রাখতে পারছে না। তারা বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে। অপরদিকে, দেশের বিপুল অদক্ষ জনসম্পদকে দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে রপ্তানিকরণের কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা সরকারের নেই। জাপানের সমৃদ্ধির মূলে ছিল Technological Revolution । আর আরব বিশ্বে মিশর টিকে আছে তার বিপুল দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি করে। বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের এ ব্যাপারে কোন উদ্বেগ ও উদ্যোগ নেই। সুতরাং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ শুধুমাত্র জনশক্তি রপ্তানি আয় থেকে বেঁচে থাকতে পারতো এমন সম্ভাবনাকে আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। আমাদের রপ্তানিযোগ্য সোনালী আঁশ ইতোমধ্যে ধূসর হয়ে গেছে। ১৯৭২ সালের দিকে দিল্লীতে OJEC সদর দফতর স্থাপনার পর পাট-লোপাট হয়ে গেছে। এটা সবারই জানা কথা। চামড়া, চা, চিংড়ি মাছ ও গার্মেন্টিস এর ভাল সম্ভাবনা বাংলাদেশে রয়েছে বলে আন্তর্জাতিক অর্থসমীক্ষকরা মনে করেন। গার্মেন্টেস শিল্প মালিকরা পানির দামে শ্রম বিনিয়োগ করছে একথা যেমন সত্য তেমনি সত্য ঐ শিল্পকে

www.pathagar.com

ধ্বংস করার জন্য চেনা জানা এজেন্টরা কাজ করছে। জাতীয় প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের বনায়ন অপ্রতুল। তবে সরকার ও অন্যান্য সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে বনায়ন কর্মসূচি উৎসাহব্যঞ্জক। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন সামুদ্রিক মাছ দিয়েই নাকি বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা যায় অথচ আমাদের সম্পদ আহরণ করছে বিদেশী রাষ্ট্র।

আমাদের দারিদ্র বিমোচনের সামগ্রিক কোন কর্মসূচি নেই। আমাদের নিজস্ব সহায়-সম্পদকে কাজে লাগানোর কোন পরিকল্পনা নেই। তাই এ অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে দেশী-বিদেশী নানা মতলববাজ এনজিও-গুলো। এসব এনজিও আমাদের জনগণের ঈমান ও আকিদাকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আবার কোন কোনটি রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। নিছক মানবিক উদ্দেশ্যে কাজ করছে এমন এনজিও যে নেই তা নয়। তবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতদের প্রতিযোগিতায় সেগুলো নিষ্প্রভ।[৮] ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জাতীয় আদর্শ সংরক্ষণ, সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগ এবং স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে এসব এনজিও হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ মনে করেন ইতোমধ্যেই ঐসব এনজিও সরকারের প্যারালাল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কাজ করছে।[৯] আমরা শক্ত হাতে ঐগুলো প্রতিরোধ না করার কারণে বিজয়ের ২৮ বছর পরেও দেখতে পাচ্ছি আমাদের 'সামাজিক নিরাপত্তা অপরাধী চক্রের হাতে জিম্মি', আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা সন্ত্রাসী তৎপরতার মধ্যে স্থবির ও ব্যাহত, আমাদের সংস্কৃতি কালো হাতের শিকার। স্বাধীনতার এতগুলো বছর ধরে স্বকীয় চিন্তা-চেতনা ও সুস্থ বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে রাজনৈতিক নীল-নক্সার সংস্কৃতি এতটাই বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে, বিটিভি-র মতো সরকারি প্রচার মাধ্যম, নাটক, সিনেমা রীতিমত 'বিপজ্জনক' বলে প্রতিভাত হচ্ছে।[১০] আমরা সবাই জানি সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণবাদ তার আগ্রাসনের রণকৌশল পাল্টেছে। সংস্কৃতি এখন তাদের নীরব অস্ত্র। আমাদের সাংস্কৃতিক সীমান্ত রীতিমত বিপন্ন। সাংস্কৃতিক সীমান্তের এই বেহাল অবস্থা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে ভৌগোলিক সীমান্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

চ. জাতির অর্থনৈতিক তথা বৈষয়িক বিষয়গুলো পর্যালোচনার পর নীতিগত বা আদর্শিক দিকগুলো বিবৃত করা যাক।

উপনিবেশবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর পরই নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত জাতিগুলো যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহলো ঃ জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ, জাতীয় সংহতি নির্মাণ, বিভিন্নমুখী জনগোষ্ঠীকে একক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে সুবিন্যস্তকরণ।[১১] জাতি গঠনের অর্থই হচ্ছে জাতিসত্তার উপলব্ধি এবং

www.pathagar.com

অখণ্ড জাতীয়তার ভিত্তি নির্মাণ।[১২] জাতি ও জাতীয়তাবাদের আবশ্যিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো অর্জনের কাঙ্ক্ষিত প্রয়াসে এসব জাতিসমূহ নিরন্তর নিয়োজিত। আর এজন্যই Rupert Emerson সঙ্গতভাবেই এই দেশগুলোকে বলেন ঃ "Are not yet nations in bing but only in hope."[১৩] বাংলাদেশও এ প্রেক্ষিতে একটি অভিন্ন উদাহরণ। বিশেষত স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলী ক্রমে ক্রমে দেশকে একটি জাতি পরিচিতির সাংঘর্ষিক পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। একজন গবেষক বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করেন "When the desired nationalism is achieved the past sentiment and values became prominant."[১৪] এই সময় শাসক এলিটদের কতিপয় কার্যব্যবস্থা জনমনে তাদের ধর্মীয় নীতি অবস্থান সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। বৃহৎপ্রতিবেশীর সম্প্রসারণবাদী ভূমিকা এবং বৈষয়িক বিষয়ে শাসক এলিটদের ব্যর্থতা জাতি পরিচিতির সঙ্কটের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে। যদিও পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে ইসলামকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করে দর্শন বা জীবনাদর্শ হিসেবে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। সে আবেগ ও উত্তেজনায় শাসক গোষ্ঠী এই চরম সত্যকে ভুলে যায় যে, এই মানচিত্রের শতকরা ৮৭ ভাগ মানুষ ইসলামের অনুসারী। এসব কারণে জাতীয়তাবাদের নদী প্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ মোড় সূচিত হয়। সমন্বিত জাতীয়তাবাদী ধারণা থেকে মুসলিম অনুভূতির 'সচেতন বিতাড়ন' মুসলিম জাতীয়তাবাদী ধারণাকে জোরদার করে তোলে। হাজার বছর ধরে এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠী যে মুসলিম উম্মাহর সাথে একাত্ম ক্ষমতাসীনরা তা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। এসব ব্যর্থতা ও কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ স্বাধীনতা উত্তরকালে একটি কৃত্রিম জাতিসত্তার সঙ্কটে নিপতিত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী L. W.Pye একে বৈধতার সঙ্কট বলেছেন। তার ভাষায় ঃ In the other new states the question of Legitimacy is more different and it involves sentiments about what should be the underlying sprit of Government and primary goals if national efforts. For example, in some Muslim lands there is a deep desire that the state should in some fashion reflect the sprit of Islam.[১৫] গোটা জাতির এই desire যথার্থ মূল্যায়ন করতে গিয়ে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা বলেন। "Thus the secularistic approach was at stake and Muslim identity became prominant. The Religious component in national identity, ignored in the Mujib regime, received clear recognization and found rational."[১৬]

www.pathagar.com

আপাতঃদৃষ্টিতে নব কথিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও জিয়াউর রহমান সমর্থক হয়ে পড়লেও এটি কোন নতুন ধারণা নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই মানচিত্রে জনগণের মধ্যে চিরজাগরূক শাশ্বত বিশ্বাস জীবনবোধ, অর্থনৈতিক সংগ্রাম, ভাষা ও সংস্কৃতির লড়াই, স্বাধীনতার অব্যাহত আকাঙক্ষা এই জাতীয়তাবাদকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। ১২০৩ খৃস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ বিজয়, ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর আম্রকাননে সিরাজ উদ্‌দৌলার ভাগ্য বিপর্যয়, পরবর্তীকালে হাজী শরিয়তউল্লাহ, তিতুমীরের জেহাদ, ১৮৫৭ সালে প্রথম আযাদী সংগ্রাম, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, ১৯৪৮-৫২ সালে ভাষা আন্দোলন ১৯৬৯ সালে গণ আন্দোলন, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ—এই জাতির বর্ণাঢ্য ইতিহাসের এক একটি মাইল ফলক। এই সুদীর্ঘ আত্মজাগৃতির ইতিহাসের কোন কোন ঘটনা আপাত বিরোধী মনে হতে পারে কিন্তু তা বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সূচক, ইপ্সিত গন্তব্যের বিবিধ যাত্রাপথ। ১৯৭১ সালের অর্জিত বিজয়ের পর এই মূলধারা আপাত বিভ্রান্তির শিকার হলেও ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক ঘটনাবলী, পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনসমূহ (১৯৭৯, ১৯৮১, ১৯৯১) এই মূলধারার রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়েছে। অবশেষে ১৯৯৬ সালের অবাধ নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে এই মূলধারাকে গ্রহণ করেই আওয়ামী লীগ বিজয় অর্জন করেছে।[১৭]

এই প্রাতিষ্ঠানিকতাকে ভঙ্গুর এবং বানচাল করার জন্য স্বাধীনতার ঊষালগ্নের সেই রাজনৈতিক এলিটরা আত্মবিনাশী, বিপজ্জনক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। সাধারণ ও স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ঘৃণা ছড়িয়ে তারা এই জাতির মূলধারাকে ভিন্ন পথগামী করতে চায়। ইতোমধ্যে তারা এ ব্যাপারে কিছুটা সফলও হয়েছে। কিন্তু আশার কথা এই যে, সেই চিরাচরিত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব অনুযায়ী মূলধারাও প্রতি খাতে আরও সংগঠিত ও সংহত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে জাতি কি একটি সাংঘর্ষিক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ? দেশপ্রেমিক নাগরিক সাধারণের এটাই আজ উদ্বেগাকুল জিজ্ঞাসা। রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবিদের কুমন্ত্রণা, প্রচার-জগতে মিথ্যার বেসাতি এবং জাতীয় গণমাধ্যমের মূলধারা বিরোধী ভূমিকা সর্বত্রই জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইতোমধ্যেই জাতির হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটেছে অনেকটা। সুখী-সুন্দর সমৃদ্ধ আগামী বাংলাদেশের প্রত্যাশায় আমাদেরকে এই আরোপিত বিপজ্জনক প্রয়াসকে মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু কিভাবে ?

www.pathagar.com

চ. খুব সঙ্গতভাবেই রাষ্ট্রক্ষমতার দায়িত্ব হচ্ছে জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি জোরদার করা। জাতির বিবেকবান অংশ মনে করে মূলধারার বিচ্যুতি জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করবে। বিভেদ ও হিংসার রাজনীতি জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করবে।[১৮] তবে এ থেকে উত্তরণের মৌলদায়িত্ব বর্তায় মূলধারার প্রবক্তা রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবি, পেশাজীবি তথা সমাজ সচেতন মানুষের উপর। এই মূলধারা দু'টো লক্ষ্য চিহ্নিত করতে পারে প্রাথমিক ও দীর্ঘমেয়াদী। প্রাথমিক কাজগুলো হচ্ছে ঃ 'A Red flag to oppose a redflag' অর্থাৎ বিপরীত ধারার বুদ্ধিবৃত্তিক, প্রচারমূলক, প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমকে মোকাবেলা করার জন্য সব উপায়-উপকরণের সার্বিক ও সমন্বিত প্রয়োগ। বিশেষ করে বিনোদন মাধ্যমকে রাজনীতিকরণের জবাব বিনোদনের মাধ্যমেই প্রদান। দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য হবে একটি গণঅভ্যুত্থান। এই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের প্রত্যয়ে বিপরীত ধারার রাজনৈতিক মূলোৎপাটন অপরিহার্য। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য বা অপাশ্চাত্য উপায়-উপকরণের বৈধ ও সর্বোত্তম ব্যবহারও নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

নতুন বিশ্ব বাস্তবতা তথা New World order জার্মানীর ঐক্য, পূর্ব ইউরোপে গণতন্ত্রের জোয়ার, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি, উপসাগরীয় বিপ্লব, আফগানিস্তানে যুদ্ধে মুজাহিদদের বিজয়, আলজিরিয়ার ইসলামী শক্তির বিপর্যয়, গোটা বিশ্বে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে কায়েমী স্বার্থবাদীদের ষড়যন্ত্র এবং বৃহৎ প্রতিবেশীর সম্প্রসারণবাদী কার্যক্রম সবকিছুর বিচার-বিশ্লেষণের পরেই আগামী দিনের বাংলাদেশের জন্য মূলধারার প্রবক্তাদের যাত্রাপথের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাসী মানুষের ঘোষণা হোক ঃ 'এই দেশটি তোমাদের এবং আমাদের এবং অবশেষে আমাদের।'

ছ. আমরা ইতোপূর্বে জাগতিক ও আদর্শিক ঃ দু'টো প্রেক্ষাপটেই আগামী দিনের বাংলাদেশকে বিশ্লেষণ করেছি। বস্তুত সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সমৃদ্ধ আগামী দিনের জন্য এ দু'টো একে অপরের পরিপূরক। শুধুমাত্র জাগতিক উন্নয়ন যে সুখ-শান্তি নিশ্চিত করে না পাশ্চাত্য তার প্রমাণ। আবার নৈতিক ও আদর্শিক দীক্ষা ছাড়া যে Bottomless Basket -টি যে শূন্যই থেকে যাবে বিগত তিন দশক তার প্রমাণ। সুতরাং সুখী সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য অবিনশ্বর নীল নক্সা চাই, চাই জ্ঞান ও সততা সমৃদ্ধ বনি আদম। জাতির সেই প্রত্যাশার রাজতোরণ পেরিয়ে গড়ে উঠবে আগামী দিনের বাংলাদেশ। আগামীকালের সূর্যোদয়ের মতোই নিশ্চিত সেই ভবিষ্যৎ।

www.pathagar.com

পাদটীকা

1. Hamja Alavi, "The state in post Colonial societies : Pakistan and Bangladesh." New Left Review, No. 74 July-August 1972.

2. Bangladesh Constitution has got its special feature and importance in corporation of the basic right of the Citizens namely Food, Cloth, Housig, Educational and Medicaee.

3. Edetorial comment : The daily Ittifaq, 16 December, 1992. for detail see : M. G. kabir. "post 1971 Nationalism in Bangladesh : Search for New Identity in Hafij and Rob (eds.) Nation Buildig in Bangladesh (BIISS, Dhaka, 1986) PP 46-62, M. Rashidujjaman" Chainging political Patterns in Bangladesh : Internal Cons traints and External Fears" Asian Survey, vol. 19 (9) September 1977, PP. 193-198. Abdullah Ghazi, " Muslim Bengal : A crisis of Identity in Barbara Thomas and Spencer Laven (eds.) west Bengal and Bangladesh (1973) PP. 147-161.

   S. A. Siddiqui, Pattern of Secularism in India and Bangladesh (S. A. Siddiqui, Chittagong, 1974).

4. Abdul Latif Masoom, "Bangladesh Nationalism and Trends of political development in Bangladesh" in Golam Hossain (ed.) Bangladesh : Goverment and Politics in Bengali (Academic Publisher, Dhaka, 1992).

5. For detail see, Abdul Latif Masoom, Unpublished Ph. D. dissertation : Role of the Military in Bangladesh : A political Study of Ziaur Rahman. Regime (1975-81).

6. According to Ittifaq Report : 16 December 1992.

7. Abdur Razzaq. Bangladesh State of the Nation (Dhaka University, Dhaka 1991) p. 24.

8. Gathered from a lecture by

   D. G. NGO Bureall on 3 November at the Centre for Human Development Dhaka.

9. News Report, Sangrame, 5 December 1992.

www.pathagar.com

10. For detail see, Abdul Latif Masoom. "Cultural Aggrcassion in Bangladesh" (Benagali) paper presented at a seminer press club on 10 In 1992.

11. Rounaq Jahan, Pakistan : Failure in National Integration (Dhaka. oxford, 1973) pp. 2,3

12. A. F. K. Organski, The stages of Political Development (Wesview, London, 1965) pp. 3-7

13. Repert Emerson, From Empire to Nation (Cambridge, Mass, 1960) p. 94.

14. M. G. kabir,

15. L. W. Pye. Aspects of Political development (New Delhi 1972) p. 64.

16. Iftekharuzzaman and Mahbubur Rahman, "Nation Building in Bangladesh : Perceptions problems and approach" in Hafij and Rob (eds.) Nation Building in Bangladesh (Biiss, Dhaka, 1986) p. 19.

17. For more information see, Iftekharuzzaman "Bangladesh in Tomorrow's World : Chalenges and out look," paper presented at a Seminer on Bangladesh Tomorrow : A European perspective jointly organised by BIISS and Allaincc Francise on 25 Februay 1992, p, 12 Also see, Yasif Akber, Massive victory of Nationalist Forces, Purnima. 6 March 1991, Shah Mohd Abdul Bayas, Election 1991 : Verdict on Islamic values and democracy, Inkilab, 5 May 1991, Some observations on the 1991 electionby an analyst, Nornimg sun, 6 March 1991, Mahfuz Parvez, The victory and The defect, Roabbar 3 March 1991 Miracle victory, Bikram 28-30 February Abdul Latif Masoom, Bangladeshi Nationalism in and political Development, Dinkal 10, 11, 12, 13, April 1992.

18. Mahbob Anam, on Unity and Intigrity of the Nation (Bengoli) Dinkal, 16 December 1991.

www.pathagar.com

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

ক. বক্ষমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এই পিতৃভূমিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের নামে আধিপত্যবাদী তথা আগ্রাসী সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচন এবং আমাদের করণীয় নির্ধারণ।

খ. মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে আমাদের বহমান ধারণাটি খানিকটা পর্যালোচনা আবশ্যক। আমাদের সাধারণ লোকেরা মনে করে সংস্কৃতি হচ্ছে গান-বাজনা, নাটক ইত্যাদি। আমাদের অধিকাংশ সাংস্কৃতিক কর্মজীবিরা সংস্কৃতি বলতে বোঝেন 'আনন্দের মহড়া'। আসলে সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের দর্পণ। মোতাহার হোসেন চৌধুরী সুন্দরভাবে বাঁচাকে সংস্কৃতি বলেছেন।[১] আবুল ফজল আবার মনুষ্যত্ব তথা মানব ধর্মের সাধনাকেই সংস্কৃতি বলেছেন।[২] আরনাল্ড ম্যাথিউ বলেছেন "পৃথিবী সম্বন্ধে যা উৎকৃষ্ট বলা বা চিন্তা করা হয়েছে তা জানাই হচ্ছে সংস্কৃতি।[৩] ড. আহমদ শরীফের মতে ঃ "সংস্কৃতি হলো মানুষের অর্জিত আচরণ পরিশ্রুত জীবন চেতনা।—চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে জীবনের সুন্দর শোভন, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত অভিব্যক্তি সংস্কৃতি।"[৪] নরেন বিশ্বাস সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে ঃ "সংস্কৃতির আভিধানিক অর্থ শিক্ষা বা অভ্যাস দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ বা কৃষ্টি। সম্+কৃ+ক্তি এ ব্যুৎপত্তির মধ্যেই নিহিত থাকে পরিশীলিত, পরিমার্জিত, পরিশ্রুত, নির্মলীকৃত, শুষিত এ ধরনের মনোভাবসমূহ, ফলে উৎকর্ষময় বা পরিশ্রুত জীবন চেতনাই সংস্কৃতির সারাৎসার।"[৫] আবুল মনসুর আহমদ সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন "কালচার বা সংস্কৃতি মানুষের মন ও বিকাশের বিশেষ স্তরবোধক। তার মানে কোন সমাজ বা জাতির মনে কোন এক ব্যাপারে একটা স্টাণ্ডার্ড ব্যবহার-বিধি, মোটামুটি সার্বজনীন চরিত্র ক্যারেক্টার, আচরণ বা আখলাকের রূপ ধারণ করলেই সেটাকে ঐ ব্যাপারে ঐ মানবগোষ্ঠীর কালচার বলা হয়ে থাকে।"[৬] সংস্কৃতির সবচেয়ে সহজ সংজ্ঞা দিয়েছেন এইচ. জে. লাস্কি তিনি বলেন ঃ "Culture is that what we are."[৭]

উপরের সংজ্ঞাগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে সংস্কৃতি সম্পর্কে দু'টো দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ একটি হলো কাঙ্ক্ষিত সংস্কৃতি অর্থাৎ আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে যেভাবে দেখতে চাই। আর দ্বিতীয়ত চলমান সংস্কৃতি অর্থাৎ আমাদের বর্তমান জীবন পদ্ধতি। সংস্কৃতির বাস্তব দিক সম্পর্কেই আমাদের অধিকতর আগ্রহ থাকা উচিত। আমাদের 'কোদালকে কোদাল' বলার সৎ

www.pathagar.com

সাহস থাকা উচিত। অবশ্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকবে না এমন নয়। সেই ভবিষ্যৎ অবশ্যই বর্তমানের ভিত্তির ওপর অর্জিত হতে হবে। সেই সংস্কৃতি কখনই 'আমদানিকৃত' উপর থেকে আরোপিত অথবা PL. 480 এর অধীন হবে না।

গ. সংস্কৃতির পর আগ্রাসী সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়া যাক। আগ্রাসনের মাধ্যমে কোন দেশ বা জাতিকে পদানত করার কথা আমরা জানি, আমরা এও জানি যে, সেই আগ্রাসী শক্তি যত শক্তিশালী হোক না কেন সাংস্কৃতিকভাবে বিজিত দেশটি যদি হয় সমৃদ্ধ তাহলে আগ্রাসন ব্যর্থ হতে বাধ্য। সাম্প্রতিককালের আফগানিস্তান এবং নিকট অতীতের ভিয়েতনাম এর উজ্জ্বল উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে আজাদীর আকাঙক্ষা তথা স্বকীয় সংস্কৃতিই হচ্ছে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। সাংস্কৃতিক স্বকীয়তার অভাবে একটি স্বাধীন সিকিমকে পরিণত হতে হয় একটি অঙ্গরাজ্যে। ভৌগ রাজনীতি বা ক্ষুদ্র পরিসরের চেয়েও এ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল 'লেন্দুপ দরজি সংস্কৃতি'। অথচ একই প্রেক্ষিতে স্বকীয় সংস্কৃতির কারণে কাশ্মীরে আজও 'চিনার বহ্নিমান'। আগ্রাসী সংস্কৃতি হচ্ছে 'A Victory without war' আর এই অদৃশ্য যুদ্ধের সৈনিকরা হচ্ছেন দেশীয় সাংস্কৃতিক কর্মী, ভাড়াটিয়া রাজনীতিবিদ ও সংশ্লিষ্ট মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ী। একটি জাতি তার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে যে চেতনার বলে, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সেই চেতনাকে ভোতা করে দেয়। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি দেশকে দেহ, মন ও মগজের দিক থেকে নির্দিষ্ট দেশটির প্রতি অনুগত করে তোলে। এটি অনেকটা মেকলের Brain child ধারণাটির সাথে সংগতিপূর্ণ। আরও সাদামাটা ভাষায় বললে বলতে হয় নির্দিষ্ট কোন দেশের সেনাবাহিনী সীমান্ত প্রহরী অথবা শাসককূলকে ফাঁকি দিয়ে সেই দেশটিকে নিজ আদর্শ বা সংস্কৃতি দিয়ে কাবু করা। এটি বর্তমান বিশ্বে আধিপত্যবাদের এক নতুন রণকৌশল। কারণ বর্তমান বিশ্বে স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি জাতিসমূহ এত স্পর্শকাতর যে একটি কুয়েত আক্রান্ত হলে গোটা বিশ্ব তার আজাদীর জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু লেখাপড়া, সাহিত্য, সংগীত, নাটক ও শিল্পকলা দ্বারা যদি একটি দেশকে জয় করা যায় তাহলে তার আজাদীর জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না। বর্তমান বিশ্বে রণকৌশল হিসেবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, Cultural Imperialism বা Cultural Aggression ইত্যাদি পরিভাষাগুলো গোটা বিশ্বের Academician-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ঘ. বস্তুত সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন, অবাস্তব ও অকার্যকর। যে কোন জাতির স্বাধীনতার লক্ষ্য থাকে তার সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্র্য তথা জাতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা। সেই হিসেবে জাতীয় সংস্কৃতিই যে

www.pathagar.com

কোন জাতির স্বাধীনতার মূল ভিত্তি। এ এমন এক ভিত্তি যা তাকে অন্যান্য জাতির তুলনায় স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য দান করে। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব জীবনাদর্শ থাকে। থাকে নিজস্ব জাতিগত লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি যা তার সংস্কৃতিকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করে। কোন দেশ, জাতি, তার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে কতটা স্বাধীনভাবে ও কতটা সার্থকতার সাথে তার নিজস্ব আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে পারছে তার নিরিখেই তার সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার পরিমাপ করা সম্ভব। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপন্ন হলে দৃষ্টিগোচর হয়। রাজনৈতিক ডামাডোলও তোলা যায়। কিন্তু সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বিপন্ন হলে তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের স্বপ্নদ্রষ্টা আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন ঃ "রাজনৈতিক আগ্রাসনের চাইতে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অধিক মারাত্মক। কারণ রাজনৈতিক আগ্রাসন সাধারণ চোখে ধরা যায়, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বেলায় তা সম্ভব নয়।[৮] সংস্কৃতি যদি হয় কোন সমাজের সমগ্র জীবনধারা তার বস্তুগত, বৌদ্ধিক এবং আত্মিক রূপ[৯] তাহলে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণে এ জাতির আবহমান লালিত আদর্শ ও বিশ্বাস ইতিহাস ঐতিহ্য ও জনগণের জীবন পদ্ধতি বিধৃত হতে বাধ্য। বস্তুত সংস্কৃতির উপাদানসমূহের মধ্যে বিশেষত প্রাচ্য দেশসমূহে ধর্ম একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তার Discovery of India গ্রন্থে হিন্দু ধর্মকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল প্রবাহ বলে বর্ণনা করেছেন।[১০] রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Lucyan W. Pye মুসলিম দেশ-সমূহের জীবনপ্রবাহে ইসলামের অনিবার্যতা স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায় "..... in some muslim lands there is a deep desire that state should in some fashion reflect the spirit of Islam."[১১] এসব দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রাণপ্রবাহ বলে চিহ্নিত করা যায়। বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিনির্মাণে ধর্মের পরে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ভাষা। এছাড়া বাংলাদেশের আর সব সাংস্কৃতিক নির্ধারক হচ্ছে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অতীত ইতিহাস, সামষ্টিক আচার-আচরণ, সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি ইত্যাদি।

"মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে দেশ, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। ধর্ম, আদর্শ এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে মৌলিক চিন্তাধারা সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রীয় সৌধ নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে খুঁটিনাটি বিষয়গুলো নির্মাণে স্থানীয়তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু এগুলো কখনও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দিক নির্ণয় করে না। যে দিকে সে চলে সেদিকে তাকে চলায় সাহায্য করে এবং তার অলঙ্কার ও শোভা বৃদ্ধি করে।"[১২]

www.pathagar.com

আমরা জানি সংস্কৃতি হচ্ছে একটি বহতা নদীর মতো। নদী তার এই প্রবাহে ধারণ করে সকল উৎসের পানি। সময় এবং স্রোতের প্রবাহে ভেসে যায় আগাছা আবর্জনা। নদী যেমনটি আছে তেমনটি যদি থাকে তাহলে ভয়ের কোন কারণ নেই। কিন্তু যখন এর স্বাভাবিক গতিপথে একটি ফারাক্কা তৈরির অপচেষ্টা চলে বা আগ্রাসী শক্তি ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে, তখন আশংকার কারণ ঘটে বৈকি। বিগত দু' দশক ধরে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে এটা সততই প্রমাণিত হবে যে, সাংস্কৃতিক নদীকে তার স্বাভাবিক বহতায় প্রবাহিত হতে দেয়া হয়নি। সাংস্কৃতিক বিভিন্ন মাধ্যমে সিনেমা, নাটক, গান, ভিডিও ফিল্ম, সংস্কৃতি সংগঠন, রেডিও টিভি, সাহিত্য ও শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি কার্যক্রম গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে সংস্কৃতির অস্বাভাবিক দিকগুলো বেরিয়ে আসবে। এ অস্বাভাবিক কর্মের দেও-দানবদের রয়েছে নানা ধরনের শ্রেণী বিন্যাস, পরিচিতি এবং ইতিবৃত্ত। সাংস্কৃতিক অঙ্গনের এসব কর্তা ব্যক্তিরা কোথায়, কিভাবে কার স্বার্থে জাতির প্রবহমান ও কাঙ্ক্ষিত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন তা উদ্ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন জাতি হিসেবে আমাদের বেঁচে থাকার স্বার্থেই। আর তা না হলে কালের কপোল তলে রাজনৈতিক সীমান্তটি উবে যেতে পারে।

বস্তুত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে তিনটি প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ

ক. আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

খ. পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ

গ. অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র

এর মধ্যে আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে।

ঙ. এক ঃ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে দিল্লী-কলকাতার কর্তা ব্যক্তিদের দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়। ১৯৭২ সালে একটি রাজনৈতিক চুক্তির পাশাপাশি একটি সাংস্কৃতিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার নামে বিশেষজ্ঞ আমদানি, সফর বিনিময়, বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম চালু করা হয়। বাংলা একাডেমী অথবা রমনার বটমূলে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে দাদাদের ভিড় লক্ষ করা যায়। ভারতীয় বইপত্র আইনানুগভাবে অবাধে আমদানি করা হতে থাকে। বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্প সে সময় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।[১৩] এভাবেই কাটে বাংলাদেশের প্রাথমিক

www.pathagar.com

বছরগুলো (১৯৭২-১৯৭৫)। এ সময় রাজনৈতিক প্রভুত্ব, অর্থনৈতিক গোলামী এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বাংলাদেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে। ইতোমধ্যে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আরোপ করা হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক এলিটরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এমন সব কার্যক্রম গ্রহণ করেন যা জনসাধারণের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নের উদ্রেক করে। তারা ভারতীয়দের চেয়েও বেশি ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে পড়েন। তারা জাতীয় জীবনের সর্বস্তর থেকে মুসলিম বা ইসলামী শব্দ, সম্ভাষণ, আচার-আচরণ ও আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করেন। প্রাথমিক প্রচার মাধ্যমগুলো মুসলমানী সম্বোধন 'আস্সালামু আলাইকুম' ও 'খোদা হাফেজ' বলা থেকে বিরত থাকে। প্রচার মাধ্যম ও সমস্ত আনুষ্ঠানিকতায় কুরআন তেলাওয়াত বর্জন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক থেকে আল কুরআনের আয়াত প্রত্যাহার করা হয়। যাবতীয় প্রতিষ্ঠান বা সড়কের নাম থেকে 'ইসলাম' 'মুসলিম' বা মুসলমান নেতাদের নাম বাদ দেয়া হয় যেমন, পুরানো ঢাকার ইসলামিয়া কলেজের নাম পরিবর্তন করে কবি নজরুল কলেজ করা হয়, সলিমুল্লাহ হল ও ফজলুল হক হল থেকে মুসলিম শব্দটি বিতাড়ন করা হয়। রাষ্ট্র প্রধান ঈদ বা ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বাণী প্রদানে বিরত থাকেন। মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেয়ার চক্রান্ত করা হয়। অবস্থা এতই শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায় যে, মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী সরকারের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন, মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা চালান এবং অধ্যাপক আবুল ফজল পত্রিকায় নিবন্ধ লিখে সরকারকে আগুন নিয়ে খেলা না করার আহ্বান জানান। পরবর্তীকালে কোন কোন ক্ষেত্রে যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন হলেও ধর্মনিরপেক্ষ ধারা অব্যাহত থাকে।[১৪]

দুই ঃ ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক সম্পর্কের মতো সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী শক্তি ক্ষমতায় থাকায় ভারতীয় সাংস্কৃতিক দৌরাত্ম্য অনেকটা কমে আসে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ভারতীয় জনমত ও সরকারের কাছে অবন্ধুসুলভ ব্যক্তিত্ব বলে প্রতিভাত হওয়ায় সম্পর্কের টানাপোড়েন ঘটে। জিয়াউর রহমান ১৯৮১ সালে নিহত হন। শহীদ জিয়ার ভারতীয় আগ্রাসন বিরোধী কার্যব্যবস্থাই তার মৃত্যুর কারণ বলে দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করা হয়।[১৫] শহীদ জিয়ার আমলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় আগ্রাসন অবশ্য থেমে থাকেনি। তবে তা একটি সীমাবদ্ধতার মধ্যে চলে আসে।

তিন ঃ ১৯৮২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে কুপোকাত করে যে সেনানায়ক ক্ষমতাসীন হলেন তার আমলে

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক ভারতের সাথে সখ্যতা চরমে পৌঁছে। ভারতীয় পত্র-পত্রিকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৮০-৮১ সালের তুলনায় বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় প্রায় চার গুণ। ভারতীয় টাটা, বিড়লা, গাইকোয়ার, গোয়েঙ্কারা রীতিমত অবাধ বাণিজ্যের সুবিধে লাভ করে। ভারতের সাংস্কৃতিক দিকপালরাও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়নি। এরশাদকে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার বাহক বলে বর্ণনা করা হয়। পশ্চিম বাংলার প্রকাশনা শিল্পসম্রাট আনন্দ বাজার গ্রুপ নানাভাবে এরশাদের গুণকীর্তন করে। আনন্দ বাজারের কোন এক রবি বাসরীয় সংখ্যায় রাষ্ট্রপতির দিনকাল শিরোনামে এক ফিচার ফেঁদে তার প্রশস্তি গাওয়া হয়। বাংলাদেশে ভারতীয় প্রকাশনার এখন যে ছড়াছড়ি লক্ষ করা যাচ্ছে তার উত্তরাধিকারের উৎস ঐ আনন্দ বাজারী প্রশস্তিতেই নিহিত। বস্তুত বাণিজ্যেই যাদের অবস্থান, দেশ প্রেম ও নৈতিকতা কেবল লোক দেখানো ভড়ং, তাদের কাছে জাতীয় সংস্কৃতির বিনাশ মামুলী ব্যাপার মাত্র। বস্তুত স্বৈরাচারীর এক দশকে সিনেমা, ভিডিও, নাটক, পত্র-পত্রিকা ও বই পুস্তকের মাধ্যমে যে বিশাল বাজার তারা এখানে গড়ে তুলেছেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। আরও বিস্ময়কর ঘটনা তখনই ঘটে যখন পণ্ডিত রবিশংকর-এর মাপের একজন ভারতীয় বাংলাদেশে এসে এরশাদের ভুয়শী প্রশংসা করেন। এখন আমরা সামগ্রিকভাবে আমাদের মহান প্রতিবেশী দ্বারা যেসব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আগ্রাসনের সম্মুখীন হচ্ছি তার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করব।

সঙ্গীত ঃ সঙ্গীতে রয়েছে বিশাল ভারতের বিশাল প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ এই বিশাল পরাক্রমের কাছে ইতোমধ্যেই বিপুলভাবে পরাজিত হয়েছে। এখন বাংলাদেশে যেখানে সেখানে নগরে, বন্দরে অথবা গ্রামে শুধুমাত্র ভারতীয় সঙ্গীতের ছড়াছড়ি। দৃশ্যত এখন ভারতীয় সঙ্গীত আর বাংলাদেশী সঙ্গীতের আর কোন সীমান্ত নেই। যে গান গায় চপল কিশোর ভারতের রাজস্থানে অথবা কোলকাতার রেল সড়কে সেই একই সুর ভেসে আসে ঢাকার টোকাইয়ের কণ্ঠে। এরপরও কি বলা যাবে সঙ্গীতে আমাদের স্বকীয়তা, স্বাধীনতা বেঁচে আছে ? না আমরা রুদ্ধ দুয়ার নীতিতে বিশ্বাস করি না কিন্তু যে দুয়ার খোলা রাখলে ঘরে কিছু থাকে না সে দুয়ার কি খোলা রাখা যায় ? বাংলাদেশের সঙ্গীতের এক বিপুল অংশ সুরে ছন্দে এবং ভাষায় ভারতীয় গানগুলোর হুবহু নকল। এ আর এক ধরনের হীনমন্যতা।

ভারতীয় সঙ্গীতের অশরীরী উপস্থিতি এখন আবার শরীরী উপস্থিতিতে গড়াচ্ছে। দুটো জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত রিপোর্টে জানা গেছে যে, গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচিত হওয়ার পরে বাংলাদেশস্থ ভারত প্রেমিকরা Anti-Indian ইমেজকে কৌশলে মোকাবিলা করার জন্য যখন তখন দাদা বাবুদের ডাকছেন।

www.pathagar.com

একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, নভেম্বর ৯৬ থেকে মার্চ ৯৯ পর্যন্ত মোট ১১৬টি ভারতীয় সাংস্কৃতিক দল বাংলাদেশে এসেছে। এসব প্রতিনিধি দল কখনও মনোজ্ঞ সঙ্গীত সন্ধ্যার মাধ্যমে অথবা চিত্র প্রদর্শনীতে অথবা যৌথ প্রযোজনার নামে হর-হামেশা বাংলাদেশের সংস্কৃতি 'সমৃদ্ধ' (!) করছেন। বাংলাদেশের প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবিবৃন্দ এদের পোষণ-তোষণ করেন।[১৬] পত্র-পত্রিকায় খবর বের হয় ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পীর 'সুরের মুর্ছনায় জনগণ আবিষ্ট।'[১৭] এভাবে আবিষ্ট হতে হতে হেমন্ত হৈমন্তীরা কবে যে আমাদের স্বাধীনতাকেই আবিষ্ট করে তুলবে তা কে জানে ? কোন এক পংকজ উদাস একদিন আমাদের সার্বভৌমত্বকেই যে উদাস করে তুলবে না তা কে বলতে পারে। 'সব ক'টি জানালা খুলে দিতে' আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু 'বাতায়ন পথে' যদি এ জাতির প্রাণ পাখি উড়ে যায় সেখানেই আমাদের আশংকা।

ছায়াছবি ঃ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আর একটি ভয়াবহ আগ্রাসী শক্তি হচ্ছে ভারতীয় ছায়াছবি। এখন বাংলাদেশে সিনেমা মানেই ভারতীয় ছবি। বিশেষত হিন্দী ছবি। বাংলাদেশের সমাজ জীবনে এর কুপ্রভাব লক্ষণীয়। প্রথমতঃ মারদাঙ্গা ধরনের এসব ছায়াছবি যুব সমাজের মেধা ও সুকুমারবৃত্তি নষ্ট করে দিয়ে তাদের বিপথগামী করছে। দ্বিতীয়তঃ তাদের আচার-আচরণ, পোশাক-আশাক ও জীবন পদ্ধতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। ভারত বিশাল দেশ হওয়ার কারণে তাদের চলচ্চিত্রেও রয়েছে বিশালত্ব। সুতরাং বাংলাদেশের চলচ্চিত্রসেবীরা ঐ 'শ্বেত হস্তির' মোকাবিলায় নিতান্তই অসহায়। তাই ইতোমধ্যে ভারতের আর সব অঙ্গ রাজ্যের মতো বাংলাদেশেও যেন একটি অঙ্গ রাজ্যের মত বাজার হয়ে উঠেছে। আমাদের নির্মাতারা ভারতীয় ছবির নকল তৈরির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত এবং যারা দেশীয় বৈশিষ্ট্য ও উন্নত সংস্কৃতির মান নিয়ে ছবি তৈরি করতে যাচ্ছেন তারা বাণিজ্যিকভাবে মার খাচ্ছেন। স্বাধীনতার প্রাথমিক বছরগুলোতে কয়েকটি শিল্পমানসম ছবি নির্মিত হলেও গত এক দশকে অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। হিন্দি ছবির স্টাইলে নির্মিত অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ বীভৎস এসব ছবি ঐ ধরনের দর্শকমন তৈরি করছে। সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রমাণ করবে বাংলাদেশের সামাজিক অপরাধসমূহের অন্ততঃ ষাট ভাগ এই হিন্দি ছবি থেকে উদ্ভূত। বাংলাদেশের জনজীবনে যেখানে আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় অত্যন্ত তীব্র সেখানে হিন্দি ছবির এই প্রভাব প্রতিপত্তি আমাদের অবশিষ্ট মানসিক মূল্যবোধ নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এটি এক অদৃশ্য দানব। এই দানব এত শক্তিশালী যে এ দেশের একটি কিশোরও ভারতীয় হিরো-হিরোইনদের চেনে এবং একজন অমিতাভ বচ্চন অথবা শ্রীদেবীর আরাধনা করে। বাংলাদেশে এসব হিরো-হিরোইনদের

www.pathagar.com

পোষ্টারের ছড়াছড়ি দেখলেই বিপদের গভীরতা বোঝা যাবে। এসব হিরোইনদের আরাধনা করতে করতে আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তানরা যদি নিজেদের অজ্ঞাতসারে ভারত মাতার আরাধনা শুরু করে তাহলে আমাদের অস্তিত্ব থাকবে কি ?

ইদানিং এ ছায়াছবির ক্ষেত্রে নতুন আগ্রাসী মাত্রা যোগ হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের ভাবাদর্শ এমনকি জাতির সংহতির জন্য বিপজ্জনক ভারত-বাংলাদেশ যৌথ প্রযোজনার আয়োজনও ইতোমধ্যে সুসম্পন্ন হয়েছে। সেই বহুল আলোচিত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম' মাঝখানের সীমা-রেখাকে মুছে দেয়ার লক্ষ্যেই পরিচালিত বলে এ দেশের সচেতন মানুষ মনে করে। তাছাড়া ইদানিং অখণ্ড বাংলার আয়োজন আড়ালে আবডালে শ্রুতিগোচর হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডের আলোকে আমাদের জনগণ মগজে ভারতীয় হওয়ার আগেই সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

ভারতীয় বই ও পত্র-পত্রিকা ঃ ভারতীয় আগ্রাসী সংস্কৃতির আর একটি বহুল আলোচিত এবং সুদূরপ্রসারী মাধ্যম হচ্ছে ভারতীয় সাহিত্য। ভারতীয় বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা বাংলাদেশের বাজার ছেয়ে আছে। কবিতা উপন্যাস এমনকি পাঠ্য বইয়ের জন্যও আমরা ভারত তথা কোলকাতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। দেশের পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এ নিয়ে দু'/তিনটি সেমিনার করেছে। অন্যান্য মহল থেকেও প্রতিবাদ করা হয়েছে অথচ ঐ দেশীয় সুকৌশল এবং এ দেশীয় সরকারের গাফিলতির কারণে বিষয়টি এখন উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের উন্নতমানের প্রকাশনগুলোও পশ্চিম বাংলায় ঠাই পাচ্ছে না। অথচ এখানে কে. জি. পাঠ্য বই থেকে হোম ইকোনোমিক্স-এর নোট পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। এই অসম অবস্থাকে মোকাবিলা করার জন্য এ দেশীয় লেখক বুদ্ধিজীবিদের তেমন কোন উচ্চবাচ্য নেই। এদের এক শ্রেণী কোলকাতাকে সাহিত্য সংস্কৃতির কেবলা মনে করে। অপরাংশ অলস, উন্নাসিক এবং জ্ঞান চর্চাবিমুখ।

এ অবস্থায় আমাদের প্রকাশনা শিল্পই যে নষ্ট হচ্ছে তা নয় সাংস্কৃতিকভাবেও আমরা পরমুখাপেক্ষী হয়ে যাচ্ছি। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর ভারতীয় সেবাদাসদের ষড়যন্ত্রের ফলে আমরা ভারতীয় শিক্ষা, সাহিত্য সংস্কৃতির জিঞ্জিরে আবদ্ধ হতে যাচ্ছি। এসব ক্ষেত্রে বিজাতীয় আদর্শের প্রভাব, প্রসার এবং অনুপ্রবেশ আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের জন্য বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে।

চ. পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঃ বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিপজ্জনক প্রবণতা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ।

www.pathagar.com

প্রথমত ঃ পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শাসন, পাশ্চাত্য শিক্ষা, পাশ্চাত্যে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশীদের অবস্থান এবং আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের দ্রুততার কারণে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের সমাজ দেহে একটি বিশেষ স্থান করে দিয়েছে। এর ফলে আমাদের পোশাক-আশাক থেকে জীবনাচারের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রতিপত্তি তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। ভারতের মতোই চলচ্চিত্র ও ভিডিও ক্যাসেট ইত্যাদি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যেও বড় অবাধ বিচরণ। তবে পর্ণো সাহিত্য এবং পোশাকী বাহারীতেই এর প্রকাশ বেশি। পাশ্চাত্যে বসবাসকারী আমাদের নাগরিকেরা যখন দেশে ফেরেন তখন ওদের বিকৃতির অনুসরণে নানা ধরনের 'সাংস্কৃতিক আবর্জনা' আমদানি করেন। পাঙ্কস থেকে এইডস তথা মুক্ত যৌনাচার এর ধারণা দ্বারা তারা সমাজ দেহকে কলুষিত করেন। এরা নানা ধরনের কনসার্ট, ব্যাণ্ড ইত্যাদির অনুসরণে দেশেও ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছেন। এরা সবাই চিন্তা-চেতনায় এক একজন মাইকেল জ্যাকসন অথবা ম্যাডোনা। অনুকরণ প্রিয় বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর জন্য এই অতি আধুনিক প্রবণতা বিপজ্জনক।

ছ. অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্র ঃ বাইরের আগ্রাসী সংস্কৃতি অথবা অনুপ্রবেশ সংস্কৃতির চেয়েও ক্ষতিকারক, বিপজ্জনক এবং সর্বগ্রাসী হলো অভ্যন্তরীণ সংস্কৃতির আগ্রাসী তৎপরতা। বাইরের শত্রুর ব্যাপারে সতর্কতা সহজ কিন্তু ঘরের শত্রু বিভীষণই সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই দেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো, বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমলাতন্ত্রে দু' ধরনের সেবাদাস রয়েছে। একদল হচ্ছে সেকালের কথিত সেই ব্রেইন চাইল্ড—যারা চিন্তায় পাশ্চাত্যবাদী আর দেহে বাংলাদেশী। দ্বিতীয় দল হচ্ছে, পরাক্রমশালী প্রতিবেশীর বশংবদ আজ্ঞাবহ। এ আজ্ঞাবহ অংশটি দেশের জন্য প্রথম অংশটির চেয়েও বিপজ্জনক। তার কারণ প্রথম অংশটির অন্তত দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় অংশটির আনুগত্য কোন্ দেশের প্রতি তা রীতিমত গবেষণা সাপেক্ষ ব্যাপার। দ্বিতীয় অংশটির মতে যা কিছু ভারতীয়, যা কিছু ঐ দেশ থেকে আগত তা-ই উত্তম। ভারতীয় আধিপত্যবাদের এসব দালালেরা আমাদের জাতীয়তা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জাতীয় ব্যক্তিত্ব, জাতীয় আদর্শ ইত্যাদি সম্পর্কে সবসময়ই বিভ্রান্তিকর, ভারতীয় স্বার্থানুগ ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। জনগণ বিচ্ছিন্ন, জাতীয় ভাবাদর্শ বিশ্লিষ্ট এবং তথাকথিত প্রগতিশীল এসব লোকেরা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর রাখেন না। একটি নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে আবর্তমান এসব চিহ্নিত বুদ্ধিজীবীরা অহমিকা, আত্মম্ভরিতা, পণ্ডিতম্মন্য এবং আত্মপ্রচার দ্বারা এতই বিমোহিত অন্যকে বোঝার বা শেখার মন-মানসিকতা এরা রাখেন না। নিজেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এরা যে দেশ,

www.pathagar.com

সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতি করছেন—তাও হয়তো এরা বোঝেন না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদি গুরু প্লেটোর মতো করে বলা যায়, "এরা ঔদ্ধত্যকে অভিহিত করে আভিজাত্য বলে অরাজকতাকে বলে স্বাধীনতা এবং অপব্যয়কে বলে মহানুভবতা আর মূর্খতাকে বলে বিক্রম।"[১৮] বিশেষ করে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠের কতিপয় রাজনীতিক পণ্ডিতদের সম্পর্কে এ মন্তব্যটি যথার্থ। এখন আমরা অতি সংক্ষেপে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে আগ্রাসী সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

জ. এক বাংলা একাডেমী ঃ ১৯৪৮ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ "আমাদের কথা আমাদের মতো করিয়া বলিবার জন্য"[১৯] যে প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন করেছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানটি এখন 'আমাদের কথা তাহাদের মতো করিয়া বলিতেছে'।[২০] ৭২/৭৫ সালে একাডেমীর বটমূলে দাদাদের ভিড় আপনারা দেখেছেন। প্রকাশনা গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ জাতির অগ্রপথিক কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে গবেষণার চেয়ে তাদের 'সাম্প্রদায়িক' 'প্রতিক্রিয়াশীল' 'সুবিধাবাদী' ইত্যাদি অভিধায় অভিযুক্ত করা হয়েছে বরং বেশি। সেখানে ধর্মনিরপেক্ষবাদী তথা কলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের অবাধ রাজত্ব। যারা ইসলামে বিশ্বাস করেন অথবা জাতীয়তাবাদী চিন্তায় বিশ্বাসী তারা সেখানে এক রকম নির্বাসিত। জনৈক প্রবীণ শিক্ষাবিদ এ লেখকের সাথে এক সাক্ষাতকারে অভিযোগ করেন তিনি দীর্ঘকাল গবেষণা করে বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র মুসলিম কবি-লেখকদের একটি জীবনপঞ্জি তৈরি করেন। বাংলা একাডেমী মুসলিম শব্দটি তুলে দেয়ার শর্তে তা প্রকাশ করতে চায়।[২১] বাংলা একাডেমীর বই মেলায় ইসলাম ও মুসলিম চেতনার কোন প্রকাশককে স্টল বরাদ্দ দিতে অনীহা প্রকাশ করেন। একাডেমীর মেলায় ইসলামী বই-পুস্তক পুড়িয়ে দেয়ার মতো লজ্জাকর ঘটনা ঘটেছে। অথচ ভারতের সব বই মেলাগুলোতে তাদের ইসলামী প্রকাশনীগুলোর স্টল খুলতে কোন অসুবিধা হয়নি।[২২] জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় বিশ্বাসের অনুকূলে পরিচালিত হওয়া উচিত।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ঃ শিল্পকলা একাডেমী প্রায়শই তাদের ভাষায় ক্লাসিকাল কর্মকাণ্ড নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। বিদেশ ভ্রমণ এবং বিদেশী শিল্পকলা প্রদর্শনী ছাড়া তেমন আর কোন কার্যক্রম চোখে পড়ে না। স্বকীয় সংস্কৃতির সন্ধান তথা লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ যেখানে শিল্পকলা একাডেমীর লক্ষ্য হওয়া উচিত সে ক্ষেত্রে তাদের তেমন কোন উদ্যোগ নেই। জাতীয় জাদুঘর, এশিয়াটিক সোসাইটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় আদর্শের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে না।

www.pathagar.com

রেডিও-টেলিভিশন ঃ জাতীয় আদর্শের উন্নয়ন-এর প্রেক্ষিতে জাতীয় প্রচার মাধ্যমসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত আপত্তিকর। বি. টি. ভি'র কর্তৃত্বে ১৯৬২ সাল থেকে যারা প্রতিষ্ঠিত আছেন তাদের অনেকেরই বাম রাজনীতির প্রতি কমিটমেন্ট ছিল। তাদের এ কমিটমেন্টের কারণে তারা একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। স্বাধীনতার প্রথম তিন বছরে তারা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করেন। '৭৫/৮১ সালে তারা ডাণ্ডার ভয়ে ঠাণ্ডা থাকেন। '৮২ সাল থেকে '৯১ সাল পর্যন্ত তারা এ দেশের ইতিহাসে জঘন্যতম খলনায়ককে ব্যবহার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করেন। স্বৈরাচারীর এক দশকের টি. ভি প্রোগ্রাম যদি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে একদিকে তারা স্বৈরাচারী এরশাদকে দিয়েছে ন্যক্কারজনক ব্যক্তি পূজা, অপরদিকে ছলে বলে-কলে কৌশলে জাতিকে বিভক্তকরণ প্রক্রিয়া করেছে তীব্রতর। আজকে এ মুহূর্তে জাতি যে সংঘাতের পথ মোকাবেলা করছে তার নেপথ্যের নায়ক-নায়িকারা এরশাদের কোলে-পিঠে মানুষ হয়েছে। এরশাদের আমলেই 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা', 'স্বায়ত্তশাসন', 'পেশাগত দায়িত্ব' ইত্যাদি ছদ্ম আবরণে ইসলাম ও মুসলিম সংস্কৃতির উপর আঘাত হানতে শুরু করে। সব বদমাশ চরিত্রগুলোকে টুপি-দাড়ি পরিয়ে দেয়া, ইসলাম পন্থীদের প্রতি ঘৃণা প্রচার, ইসলাম উজ্জীবনের নামে ইসলামের সর্বনাশ সাধন, চিহ্নিত ব্যক্তিদের দ্বারা ইজম প্রচার ইত্যাদি ছিল বি. টি. ভি'র নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। আজও তার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। দেহটি ঠিকই আছে খোলস পাল্টেছে মাত্র। সেখানে ঠগ বাঁচতে গাঁ উজাড় অবস্থা। শিল্পকলার এ টেকনিক্যাল দিকটি সম্পর্কে যারা খোঁজ-খবর রাখেন তারা স্বীকার করবেন যে, এখানে মগজটি স্বাভাবিকভাবে কাজ না করলে তাকে দিয়ে কাজ করানো অসম্ভব ব্যাপার। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কর্মরত লোকেরা অত্যন্ত সুচতুরভাবে এবং দৃশ্যত স্বাভাবিক পথে এমন অনেক 'মিশন' পুরো করছেন যা অনেক সুদূরপ্রসারী ফল বহন করে। এবারের নজরুল জয়ন্তীতে নজরুলের কোন ইসলামী গান প্রচারিত হয়নি। এটি ওখানে অবস্থানরত লোকেরা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই বাদ দিয়েছেন। লক্ষণীয় যে, বি. টি. ভি ইদানিং ভারতীয় সংস্কৃতিসেবীদের বড় বেশি আদর আত্তি করছেন। এদের এসব কার্যক্রম আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। এদের সাথে ওপার বাংলার আত্মীয়দের যোগসাজশ বাংলাদেশে ভিনদেশী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন জোরদার করছে। রেডিওর ক্ষেত্রেও কম বেশি একই মূল্যায়ন প্রযোজ্য।

সংবাদপত্র ঃ বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ক্ষেত্রে কোন কোন সংবাদপত্র হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। গোপন উৎস থেকে প্রাপ্ত বিপুল

www.pathagar.com

অংকের অর্থের বিনিময়ে এসব পত্র-পত্রিকা তাদের উদ্দিষ্ট পরিকল্পনা মোতাবেক বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই পত্র-পত্রিকাগুলো বিভেদ, হতাশা নৈরাজ্য ইত্যাদির বাহক হিসেবে কাজ করছে। ঐসব সংবাদপত্রে ভারতের স্বার্থবিরোধী কোন সংবাদ ছাপা হয় সপ্তম পৃষ্ঠার কলামে অথবা জাতীয়তাবাদী কোন সংবাদ ছাপা হয় নামকাওয়াস্তে তখন বুঝতে হবে 'ডালমে কুচ কালা হায়'। কিছু কিছু কালা, কিছু কিছু বিড়াল ইতোমধ্যেই থলে থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আশা করি সাধারণ মানুষ অচিরেই আরো কিছু জানতে পারবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড ঃ বাংলাদেশী গোটা জাতির স্কুল পর্যায়ের পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করার দায়িত্ব এন. সি. টি. বি এর। এন. সি. টি. বি'র কর্তৃপক্ষ সৎ ও সুন্দরভাবে এই কার্যক্রম পরিচালনা করার সদিচ্ছা রাখলেও কিছু চিহ্নিত আমলা অথবা কায়েমী-স্বার্থবাদী মহল এসব কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করে আসছে। এরা কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের এন. সি. টি. বি-এর উপদেষ্টা বা পরামর্শক করতে মাঝে মধ্যেই চাপ দেয়। শান্তি নিকেতনি জনৈকা মহিলাকে চাপিয়ে দিয়ে তারা এক সময় বেশ ফায়দা লুটে ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যিনি নিজ হাতে আল্লাহর পরিবর্তে সৃষ্টিকর্তা লিখেছিলেন তিনি ছিলেন এক উচুদরের আমলা। তিনি ভারতীয় স্টাইলে সব পাঠ্যপুস্তক পুনর্গঠনে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। গণরোষে ঐ সময় তাদের অনেক ষড়যন্ত্র আতুর ঘরেই মৃত্যুবরণ করে। এন. সি. টি. বি'র মূল কার্যক্রম জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতেই পরিচালিত হওয়া উচিত।

এন. জি. ও ঃ বাংলাদেশে যেসব এন. জি. ও কাজ করছে সেগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) সত্যিকার জনকল্যাণার্থে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। (খ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংগঠন এবং (গ) খৃষ্টান ধর্মীয় লক্ষ্যে পরিচালিত সংস্থা। ধীরে ধীরে এন. জি. ও-গুলো বিদেশী নীল নকশার আওতায় আমাদের রক্ষণশীল সমাজের সুস্থ নারী সংস্কৃতিকে বিকৃতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে ; ফলে ভেঙ্গে যাচ্ছে বহু পরিবার এবং সংসার। বিভ্রান্ত হচ্ছে বহু অবুঝ নারী, প্রতারিত হচ্ছে তাদের নারী মানসিকতা। আর এভাবেই অসুস্থ সাংস্কৃতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করছে এন.জি.ও-গুলো, যা আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি বিকাশে প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিতে পারে।[২৩] বস্তুত এন.জি.ও-গুলো অঢেল টাকা ঢালছে। রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। রাজনৈতিক দলের মতো কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গণউন্নয়ন ট্রাষ্ট, মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র ও বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে কাজ করছে।

www.pathagar.com

এ দেশের সবকিছুই যেন রাজনীতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। শিশু কিশোর সংগঠন ও শিক্ষক পরিষদের মতো অরাজনৈতিক ধাচের প্রতিষ্ঠানগুলোও আগ্রাসী সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি খেলাঘর আসরের দ্বিধা-বিভক্তি এবং রাজনৈতিক টানাপোড়েন লক্ষণীয়।

এতক্ষণ আমরা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর আলোচনা করলাম। এবার আমরা মন ও মননশীল তথা বিনোদনের দিকে নজর দিতে চাই।

সাহিত্য ঃ সাহিত্য মন ও মননের প্রধান বাহন। আমরা ইতোপূর্বে বাংলা সাহিত্যে ভারতীয় আগ্রাসন নিয়ে আলোচনা করেছি। বস্তুত বিগত দশকে বাংলা সাহিত্য দু'টি ধারায় ভাগ হয়ে গেছে। একটি স্বদেশমুখী অপরটি অবধারিত-ভাবেই কোলকাতামুখী। আর এই ভাগ হয়েছে রাজনৈতিক পোলারাইজেশনের ভিত্তিতে। একদল সাহিত্যিক নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে গর্ববোধ করেন। অপরদল আদর্শিক বলয়ে গন্তব্য খোঁজেন। দু' দলের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী দু'টি মানদণ্ডে সাহিত্যকর্মের বিচার করা হয়। একদল আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় গয়া কাশী বৃন্দাবনে, অপর দল নিজের মাটিতেই ঠিকানা খুঁজতে চান। একদল আরবী, ফারসী এবং মুসলমানী শব্দ দেখলেই নাক সিটকান এবং 'সংস্কৃতক' অথবা কোলকাতা কেন্দ্রিক শব্দ খোঁজেন। আগ্রাসী সংস্কৃতির ধারকেরা মরহুমকে প্রয়াত, লাশকে মরদেহ, দাফনকে শেষকৃত্য, দাওয়াতকে নেমন্তন, নাস্তাকে জলপানি, মোনাজাতকে প্রার্থনা এবং হরতালকে বন্ধ করে ফেলেছেন।

শহীদ মিনারকে এরা শহীদ বেদী বলার চেষ্টা করছেন। পরে হয়ত বলীর বেদী বলবেন। এভাবে রূহের মাগফেরাত কামনা করেন না আত্মার সদগতি কামনা করেন। তারা আগামীকাল হয়ত নামাযকে উপাসনা, রোযাকে উপবাস, হজ্জকে তীর্থযাত্রা বলবেন। যারা এসব কৃত্রিম পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন তারা জানেন না যে, "মানুষ যা বলে তাই ভাষা। ভাষা কলমের মুখ থেকে মানুষের মুখে যায় না বরং মানুষের মুখ থেকে কলমে আসে। এর বিপরীত কিছু করতে গেলে মুখে কেবল কালিই পড়ে।"[২৪] এসব পরান্নভোজীরা মুসলমানী সম্বোধন আস্‌সালামু আলাইকুম বলতেও শরমবোধ করেন। হিন্দুরা যেভাবে 'আদাব' বলে মুসলমানদের সম্বোধন করে সেটাই তারা শ্রেয়তর মনে করেন। এদের কেউ কেউ টি. ভি অনুষ্ঠানে সালামের পরিবর্তে সুপ্রভাত বা শুভ সন্ধ্যা বলে থাকেন। এসব লোকেরা প্রায়ই গণমুখী হওয়ার কথা বলেন। গণমুখী কি ৮৭% ওয়ালা সালামের প্রবক্তরা নাকি ০১% এর সুপ্রভাতিরা ? তাছাড়া

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের Good Morning-এর কষ্টকর বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে কি তাদের হীনমন্যতা প্রকাশিত হচ্ছে না ?

নাটক ঃ নাটককে সাংস্কৃতিক আগ্রাসীরা তাদের সবচেয়ে প্রিয় মাধ্যম হিসেবে মনে করে। এখানে জীবনের জন্য নাটক না হয়ে নাটক হয় 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে'। এখানে যারা ইসলাম চর্চা করেন তারা সবাই ওদের ভাষায় সাম্প্রদায়িক।[২৫] স্বাধীনতা লাভের পরে নাট্যশিল্প বাংলাদেশে বিশেষ বিকাশ লাভ করে। এই বিকাশমানতার সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে মুজিববাদ বিরোধী কর্মীদের সম্পৃক্ততা ছিল। পরবর্তীকালে সামরিক শাসনের কারণে নাটক প্রতিবাদের বাহন হয়ে ওঠে। সাম্প্রতিক বিশ্বে সমাজতন্ত্রী ধ্বসের কারণে আরো বেশি করে বামরা কর্মীদেরকে নাটক, থিয়েটারের মতো কার্যক্রমের প্রতি আসক্ত করে তোলে। এখন বাংলাদেশে নাটক তার রোমান্টিক চেহারা বা নন্দন তাত্ত্বিক অবয়ব হারিয়ে ফেলেছে।[২৬] নাটক মানেই এখন স্রেফ পলিটিক্স।

উপসংহার ঃ

(ক) এসব সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবেলায় আমাদের প্রথম ও প্রধান করণীয় আমাদের জাতীয় আদর্শ নির্ধারণ। অন্য ভাষায় আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের যে Crisis of identity রয়েছে তার সম্পূর্ণ অপনোদন। তার কারণ সংস্কৃতির মধ্যে জাতীয়তার শিকড় শক্ত না হলে জাতি পরাভূত হবে। জাতি সত্তার প্রশ্ন এবং সাংস্কৃতিক প্রশ্ন আদতে ভিন্ন কিছু নয়, আলাদা কিছু নয়। কোন জাতির জাতিত্ব বা জাতিসত্তার ভিত্তিটাই আদতে কোন না কোন সংস্কৃতি।

(খ) জাতিসত্তার সংকটের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় ছিল বিগত ৯১-এর জাতীয় নির্বাচন। ধরেই নেয়া হয়েছিল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রাতিষ্ঠানিকতা অর্জন করেছে।[২৭] কিন্তু এখন একটি আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সাংঘর্ষিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন জাতি আবার একটি সংহতি সংকট (Problems of national intigrity) এর মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে। জাতির বিজ্ঞ অভিভাবকরা একটি গৃহযুদ্ধ (Civil war) এর আশংকা করছেন।

(গ) সুতরাং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধে জাতীয় ঐকমত্যের সৃষ্টি করতে হবে।[২৭]

(ঘ) সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে রুখতে হলে জাতিকে কতিপয় ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, স্বকীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে। লোকজ কৃষ্টির পরিপুষ্টি সাধন করতে হবে।

www.pathagar.com

(ঙ) আগ্রাসী সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরা জ্ঞান ও বুদ্ধির জগতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। কোন রকম আত্মতুষ্টি, মিথ্যে অহংকারে বিব্রত না হয়ে নিজেদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

(চ) জাতীয়তাবাদী তথা ইসলামী চেতনায় বিশ্বাসী হতাশ, স্থবির দ্বিধান্বিত সকল বুদ্ধিজীবীদের উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে সমবেত করতে হবে।

(ছ) ইসলামী ভাবধারার পরিপুষ্টি ও লালনের মধ্য দিয়ে সকল নাগরিকের জন্য বিশেষত যুব সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহিমূলক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

(জ) সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের প্রতিটি দিগন্তে 'বিশ্বাসী যুক্তির রাজ্য' এবং শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সকল ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের উর্ধে উঠে নাটকের মোকাবেলায় নাটক, সিনেমার মোকাবেলায় সিনেমা, সঙ্গীতের মোকাবেলায় সঙ্গীত, কবিতার মোকাবেলায় কবিতা, উপন্যাসের মোকাবেলায় উপন্যাস গড়ে তুলতে হবে।[২৮]

বাংলাদেশের যে নাগরিক সঙ্গীত সিনেমায় সাহিত্যে ভারতীয়, রাজনৈতিক চিন্তায় বৃটিশ বা চীন দেশী, পোশাকে মার্কিন, বিদ্যায় ইউরোপীয় তারপরেও তিনি বাংলাদেশী থাকবেন সে আশা এক দুরাশা।

তাই মন-মগজ দখল করা আগ্রাসী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়ে যাবে বাংলাদেশের মানুষ চিরকাল। তাদের মেধা দেহ শ্রম দিয়ে গড়ে যাবে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা আর ঈসা খার সোনার গাঁ। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ হোক আগ্রাসী সংস্কৃতির দখলমুক্ত সুখী-সুন্দর সমুজ্জল।

www.pathagar.com

পাদটীকা

১. মোতাহের হোসেন চৌধুরী, সংস্কৃতি কথা।

২. আবুল ফজল, সমকালীন চিন্তা (বিবিধ প্রকাশনী, চট্টগ্রাম ১৯৭০) পৃঃ ১৩০।

৩. ম্যাথিউ আরনল্ড, A collection of proverbs থেকে সংগৃহীত।

৪. আহমদ শরীফ, বিচিত চিন্তা।

৫. নরেন বিশ্বাস, সুকান্ত একাডেমী আয়োজিত সংস্কৃতি বিষয়ক সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ।

৬. আবুল মনসুর আহমদ, বাংলাদেশের কালচার।

৭. Harold J. Laski, A Grammar of Politics, (George Allen & Unwin ltd. London 1963) P. 218

৮. আবুল মনসুর আহমদ, প্রাগুক্ত।

৯. Ratmond Williams, "Culture and civilization," International Encyclopedia of social sciences, vols, 1 and 2, (Macmillan an Free Press, New York, 1972).

১০. Jowherlal Nehru, Discovery of India.

১১. Lucian W. Pye, Aspects of political Development, (Amerind, New Delhi, 1972).

১২. আবদুল মান্নাব তালিব, বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব, স্মারক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ ঢাকা ২৫ নভেম্বর, ১৯৮৮।

১৩. খণ্ড চিত্রের জন্য দেখুন আবদুল মোহাইমেন, একটি আত্মার মৃত্যু (স্মৃতিচারণ) মোহাইমেন, ঢাকা, ১৯৮৮।

১৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন এস. এ. সিদ্দিকী. ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতে এবং বাংলাদেশে (সিদ্দিকী, চট্টগ্রাম, ১৯৭৪)। মুনির উদ্দিন আহমেদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশ বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর, M. G. Kabir. Post 1971.

Nationalism in Bangladesh, search for a new identity." in Hafiz & Rob (eds.), Nation Building in Bangladesh (Biiss, Dhaka, 1986) pp. 40-62.

www.pathagar.com

১৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য Abdul Latif Masoom, Role of the Military in Bangladesh. A Political study of Zia Regime (1975-81) Unpublished ph. D. Dissertation, Jadavpur University, India, 1990 Chapter (V11).

১৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, দৈনিক ইনকিলাব, ৩রা এপ্রিল, ১৯৯২ সংখ্যা।

১৭. ভারতীয় বই ও পত্র-পত্রিকা কিভাবে আগ্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন গোলাম ফারুক, "সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারের ষড়যন্ত্র" দৈনিক সংগ্রাম, ৮ই ডিসেম্বর '৯১।

১৮. সরদার ফজলুল করিম, প্লেটোর রিপাবলিক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, ১৯৮৮) ৮ ঃ ৫৬০।

১৯. ১৯৭৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যাস সম্পর্কে একটি সমীক্ষা সাপ্তাহিক বিক্রম, ২০শে জানুয়ারি ১৯৯১।

২০. নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা।

২১. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

২২. সাম মিজরাব, এন. জি. ও-গুলোর সাংস্কৃতিক দস্যুতা, ২রা ফেব্রুয়ারি '৯২ দৈনিক সংগ্রাম।

২৩. ভ. ই. লেনিন উদ্ধৃতি, বাণী চিরন্তনী।

২৪. নাটক সম্পর্কে সুন্দর আলোচনার জন্য দেখুন আরিফুল হক, আমরা ও আমাদের নাটক। দৈনিক সংগ্রাম, ৩রা মে '৯২।

২৫. দেশের রাজনৈতিক নাটক সম্পর্কে আরো দেখুন ওবায়দুল হক সরকার, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নাটক, দৈনিক ইনকিলাব, ২১শে ফেব্রুয়ারি '৯০ মুরশাদ সুবহানী, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নাটক, ইনকিলাব, ২রা ফেব্রুয়ারি '৯০।

২৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ড. আবদুল লতিফ মাসুম, "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারা," দৈনিক দিনকাল, ২৯ শে মার্চ-১৯৯২।

২৭. জাতীয় ঐকমত্যের সংকট সম্পর্কে দেখুন, আবদুল লতিফ মাসুম, "বাংলাদেশে জাতীয় ঐকমত্যের সংকট, দৈনিক ইনকিলাব, ২২-৩০ এপ্রিল '৯২।

www.pathagar.com

২৮. সংস্কৃতি বিশেষত ঃ বাংলাদেশ ভাবাদর্শের সংস্কৃতি সম্পর্কে দেখুন এ. কে. নাজমুল করিম 'সংস্কৃতির রূপান্তর' "বাঙালী মুসলিম সংস্কৃতি" এ. কে. নাজমুল করিম স্মারক গ্রন্থ। (ঢা. বি. ঢাকা-১৯৮৩)। আমিন ইসলাম-সমাজ সংস্কৃতি এবং সাহিত্য (সাত্রকে, ঢাকা-১৯৯১)। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ঐতিহ্য ও প্রগতি (ঐতিহ্য ১৯৮৫)। অধ্যাপক আবদুল গফুর, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা। সাহেদ আলী, 'প্রসঙ্গ ঃ সংস্কৃতি' দৈনিক মিল্লাত, বর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৯৮৮-৮৯। শওকত আলী, বাঙগালীর স্বরূপ অন্বেষণ, বিচিত্রা, আসকার ইবনে শাইখ, বাংলাদেশের বহমান সংস্কৃতি ধারা। স্মারক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ ৭ ও ৮ নভেম্বর ১৯৯১। আবদুল মান্নান তালিব, বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব। স্মারক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ ২৫ নভেম্বর '৮৮। আবুল আসাদ, আমাদের সংস্কৃতি ঃ বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্মারক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা-৯-১০ নভেম্বর ১৯৮৯।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের চলমান শিক্ষাব্যবস্থা

ক. ভূমিকা ঃ নিবন্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের চলমান শিক্ষাব্যবস্থার স্বরূপ অন্বেষণ। ইতিহাসের ক্রম বিবর্তনময় ধারা বেয়ে এই সময়ে (১৯৯৯) নীতি ও বাস্তবে শিক্ষার যে স্তরে আমাদের অবস্থান তা চিহ্নিত করা আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য। সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা নির্ণয় শেষে কিছু বাস্তব করণীয় নির্দেশ এই নিবন্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তবে শিক্ষাব্যবস্থার অতলান্তের গহীন গভীরে নিমগ্নতা আমাদের কাম্য নয়, এই পরিসরে সম্ভবও নয়। হাজারও সমস্যা আকীর্ণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শিক ভিত্তি ও উদ্দেশ্যাবলী ঘিরেই আমাদের প্রধানতম অন্বেষা সীমাবদ্ধ থাকবে।

খ. শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শিক ভিত্তি

শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান সমৃদ্ধ সভ্যতার সংবেদনশীল হৃদয়। সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের প্রধানতম হাতিয়ার। সমাজবিজ্ঞানীদের ভাষায় একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া বা Socialiazation Process-এর মধ্য দিয়েই তার কাঙ্ক্ষিত নাগরিক সৃষ্টি করে। উন্নয়নশীল বিশ্বের নন্দিত রাজনৈতিক বিশ্লেষক Gabriel A. Almond বলেন ঃ "All political systems tend to perpetuate their cultures and structures through time and do that mainly by means of the socializing influence of primary and secondary structures through which the young of the society pass in the process of maturation."[১] আর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাব্যবস্থাই হচ্ছে এই সামাজিকীকরণের প্রথম ও প্রধান নিয়ামক। শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপকার। শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির লালিত আদর্শ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ধারক বাহক। শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে নাগরিকদের স্বাভাবিক গুণ নির্ধারণের উপায় এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে প্রত্যেক নাগরিকের চরিত্র বিকাশের প্রধান মাধ্যম। শিক্ষার মাধ্যমেই নাগরিকদের প্রকৃতিদত্ত গুণের পরিস্ফুটন ও বিকাশ ঘটে। শিক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত নাগরিক তৈরি হয়। কিন্তু আদর্শ দর্শন বা নীতিমালা ব্যতীত শিক্ষাব্যবস্থা নামক 'ইণ্ডাষ্ট্রি' থেকে প্রত্যাশিত 'প্রডাকশন' সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা এক একজন নাগরিককে একটি বিশেষ কাজের জন্য যোগ্য করে গড়ে তুলবে। রাষ্ট্রের মধ্যে যে নাগরিকটি বসবাস করছে তার উপযুক্ত স্থানের জন্য তাকে গড়ে তুলবার ভার রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থাই

www.pathagar.com

নাগরিককে 'যার যা প্রাপ্য' তাকে তা দেবে। আর সেই কাজে তাকে নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করতে শেখাবে।

সভ্যতার প্রাতঃকালে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাতকারী প্রথম দার্শনিক প্লেটো (৪২৮-৩৪৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) শিক্ষাকে নৈতিক পরিশুদ্ধির (Moral perfection) হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার বক্তব্য সুশিক্ষা প্রবৃত্তিকে (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মৎ ও মাৎষর্য) তার উৎসমূল থেকেই বিনাশ করে। প্লেটো লিখেছেন ঃ "Education is a mental medicine to a mental malady." তিনি বলেন সর্বসাধারণের কল্যাণ "promotion of common good" নিশ্চিত করাই শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য।[২] মনীষী প্লেটোর ছাত্র প্রাচীন প্রাজ্ঞ পুরুষ এরিষ্টটল আরও একধাপ এগিয়ে বলেছেন, "সততা শিক্ষাদানই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য—নৈতিকতা প্রচারের ভার আর সত্যের অনুমোদনের দায়িত্বও রাষ্ট্রের।"[৩] বস্তুত শিক্ষাব্যবস্থাই হচ্ছে এসব মহৎ উদ্দেশ্যাবলীর বাহন।

দুনিয়ার সকল শিক্ষাদানই এ বিষয়ে একমত যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র গঠন। শিক্ষাব্যবস্থাকে ইতোপূর্বে উল্লেখিত সামাজিকীকরণ বা Socialization এর প্রধান নিয়ামক নির্ধারণ করে প্রতিটি রাষ্ট্র তার আদ্দিষ্ট নাগরিক সৃষ্টির প্রয়াস পায়। জাতির আদর্শ ও লক্ষ্য অনুযায়ী নাগরিকের মন ও মস্তিষ্ক চরিত্র ও সাধারণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিটি সজাগ সরকারের দায়িত্ব। মূলত পৃথিবীর যতটি সরকার ততটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমান। পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গুণগত ও মাত্রাগত একই উদ্দেশ্য অভিসারী নয়। আরও উদাহরণ দিয়ে বলা যায় পরস্পর প্রতিবেশী সিঙ্গাপুরের শিক্ষাব্যবস্থা বহিঃমুখী অথচ মায়ানমারের শিক্ষাব্যবস্থা অন্তঃমুখী। এর প্রকৃত কারণ হলো তাদের আদর্শ ও লক্ষ্যের পার্থক্য, জীবনবোধের বিভেদ, জাগতিক গুণাবলীর আপেক্ষিক ব্যাখ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনামূলক অবস্থান। সমাজ ও রাষ্ট্রের বৈপরীত্য এবং জাতির নিজস্ব বিশ্বাস আদর্শ ও চিরায়ত মূল্যবোধের বিভিন্ন প্রকাশ অনুযায়ী এক একটি জাতীয় রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার প্রকাশ ঘটে। খুব সঙ্গতভাবে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাও উপরোক্ত গুণাবলীর আলোকে প্রতিষ্ঠিত এবং পুনর্গঠিত হবে এটাই স্বাভাবিক।

গ. বাংলাদেশ জাতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এই জাতির হাজার বছরের লালিত বিশ্বাস ও জীবনবোধ বিরোধী কিছু নীতিমালা গৃহীত হলেও জাতির চিরঞ্জীব চেতনার কাছে ঐসব কৃত্রিম শব্দাবলী পরাজিত হয়। কোন শাসকের প্রয়োজনে

www.pathagar.com

নয়। বন্দুকের নল দ্বারা নয়। সময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অনিবার্যতায় ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক নীতিমালার পরিবর্তন সূচিত হয়। ধর্মনিরপেক্ষতা পরিত্যক্ত হয়। আল্লাহর প্রতি এই জাতির আস্থা ও বিশ্বাসের কথা দৃঢ়তার সাথে ঘোষিত হয়। জাতীয়তাবাদ নতুন ব্যাখ্যা অর্জন করে। প্রকৃত অর্থে সমাজতন্ত্রও পরিত্যক্ত হয়। সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' সংযোজিত হয়। পরবর্তীকালে ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে এর ধারাবাহিকতার পথ ধরে ১৯৮৮ সালে ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম হিসাবে ঘোষিত হয়। এসব পরিবর্তন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ জাতি কর্তৃক সমর্থিত গৃহিত ও সমাদৃত হয়। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এই নীতি আর্দশের প্রধান বিরোধী পক্ষ নীতিগত-ভাবে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাদের নির্বাচনী মেনিফেষ্টো বা কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের দলীয় গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে ঐসব বিঘোষিত নীতিমালা মেনে নেন। কতিপয় উচ্চারণে (Rhetorics) কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ করা গেলেও এটি কৌশলগত আপাদত নীতিগত নয়। সুতরাং বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা শাসনতন্ত্রের বিঘোষিত নীতিমালা ও জাতির আশা-আকাঙক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল হবে এটাই স্বাভাবিক।

ঘ. খুদা কমিশন ও জাতীয় আদর্শ

১৯৭৪ সালের ৩০শে মে ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টের প্রস্তাবনায় বলা হয় ঃ "নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য ..... জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যাতে করে সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।[৪] শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী এই শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ে সংবিধানের তৎকালীন নীতিমালার আলোকে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসে ও পুনর্গঠনের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। ১৯৭৪ সালের পর এ জাতির রাজনৈতিক উন্নয়ন অনেক চড়াই উৎরাই অতিক্রম করেছে। শাসনতন্ত্র, সমাজব্যবস্থা, রাজনৈতিক প্রথা ব্যাপক পরিবর্তনের পরও যখন এই রিপোর্টকে শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণের কথা বলা হয়[৫] তখন গণমানস বিচলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বর্তমান রাজনৈতিক এলিটদের স্পর্শকাতর বিষয়গুলো বাদ দিলেও খুব সঙ্গত-ভাবেই প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় ১৯৭৪ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত প্রায় সিকি শতাব্দী সময়ের দূরত্বকেও কি তারা বুঝতে ব্যর্থ হবেন ? ইতোমধ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে এমন সব পরিবর্তন সূচিত হয়েছে যার ফলে খুদা কমিশন রিপোর্টে বিঘোষিত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী পরিবর্তিত হতে বাধ্য।

www.pathagar.com

উদাহরণস্বরূপ ঃ সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার রূপে শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের যে অঙ্গীকার করা হয়েছে অথবা ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুসমন্বিত মানব জীবনের যে লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে,[৬] তা কি আজ এই মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক ? তবে খুদা কমিশনের প্রস্তাবনার সবকিছুই যে অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল এ রকম সংকীর্ণ ঢালাও মন্তব্য করা যায় না। এই জাতির অন্তত একটি দিক যথার্থভাবেই প্রস্তাবনায় উল্লেখিত হয়েছে। রিপোর্টের ভাষায় ঃ "জাতি হিসেবে আমাদের প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে হাতের কাজের প্রতি অনীহা এবং কায়িকশ্রমের মর্যাদাদানে কুণ্ঠাবোধ। এ মানসিকতা বিদ্যমান থাকলে দেশের গঠনমূলক উন্নয়ন মন্থরগতি হতে বাধ্য।"[৭] এ ছাড়া শিক্ষাকে প্রয়োগ উপযোগী, শিক্ষানীতিকে গতিশীল ও উন্নয়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার যে প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে তা ইতিবাচক বলে প্রতিভাত হয়েছে।

৬. খুদা কমিশন রিপোর্ট বনাম চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন

"যে শিক্ষা মানুষের আত্মা ও দেহকে এক সুন্দর সামঞ্জস্যময় পরিণতিতে পৌঁছিয়ে এই জগতের রূপরস গন্ধকে নৈতিকতার সীমার মধ্যে উপভোগ করার যোগ্যতা দান করে সেই শিক্ষাই মানুষের প্রকৃত শিক্ষা।"[৮] সেই প্রকৃত শিক্ষা অর্জন করতে হলে যে কোন শিক্ষাব্যবস্থায় নাগরিকের নৈতিক পুনর্গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে যদি নৈতিকমান সম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি না হয় তাহলে শিক্ষা থেকে সুফল লাভ সম্ভব নয়। শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রে যদি কাঙ্ক্ষিত গুণাবলী প্রবিষ্ট করা না যায় তাহলে শিক্ষাব্যবস্থাই ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। ব্যক্তি তথা প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে সত্যবাদিতা, সাধুতা, ন্যায়বোধ, নিরপেক্ষতা, শৃঙ্খলা, কর্তব্যবোধ, দেশসেবা ও মানবতার মতো মহৎ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটাতে হবে। আদর্শ ও বাস্তবতা, দর্শন ও প্রায়োগিক সমস্যা অনুধাবন করে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ও নাগরিকের এসব গুণাবলী অর্জনের প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। সন্তোষের বিষয় যে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে। রিপোর্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ে "চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন" শিরোনামে অনেক ভাল ভাল কথা বলা হয়েছে। সুপারিশ করা হয়েছে ঃ "শিক্ষাদানকালে তার মধ্যে এ সমস্ত গুণ সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে, যেন এ সকল আদর্শ অনুযায়ী চিন্তা ও কাজ করা তার পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।.....শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষার পরিবেশ পাঠ্যক্রম শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদি এরূপ হওয়া প্রয়োজন যেন শিক্ষাদানের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সুষ্ঠভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে।"[৯] রিপোর্টে এসব গুণাবলী বিকাশের জন্য "শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে

www.pathagar.com

মানুষের মৌলিক গুণাবলী বিশেষত ব্যক্তিগত ত্যাগ স্বীকার ও জাতীয় জীবনে স্মরণীয় অবদান ইত্যাদি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে। এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরও যেসব পরামর্শ দেয়া হয়েছে সেগুলো হলো ঃ অতিরিক্ত শিক্ষা কার্যক্রম, খেলাধুলা, কায়িক শ্রম, বাড়ি ও সমাজের ভূমিকা পালন ইত্যাদি। অবশেষে খুব ক্ষীণভাবে একটি কথা বলা হয়েছে ঃ "শিক্ষার্থীর মনে সুন্দর সমন্বিত মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টির উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।"[১০] কিন্তু এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা, ব্যক্তি ও প্রায়োগিক ক্ষেত্র সম্পর্কে ৩০০ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রতিবেদনে আর একটি শব্দও সংযোজিত হয়নি। অথচ পৃথিবীর যোগ্যতা, শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস এবং আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, ধর্ম এবং ধর্মই হলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের একমাত্র উৎস। আমরা বাল্যকাল থেকে এ রকম শিখে এসেছি যে, মানবজীবনের জন্য তিনটি R প্রয়োজন Reading, Writing and Arthmatic. কিন্তু তার জীবনে যদি চতুর্থ R অর্থাৎ Religion এর অনুপস্থিতি ঘটে তাহলে সেটি পরিণত হয় ৫ম 'R' এ অর্থাৎ Rascal-এ। আজকের পৃথিবীর সুউচ্চ জাগতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন সত্ত্বেও এ প্রত্যয়ের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আধুনিকায়নের জোয়ারে ভেসে যাওয়া পাশ্চাত্য সভ্যতাও এখন তীব্রভাবে Back to the Religion ধারণায় উচ্চকিত। এই শতাব্দীর অষ্টম দশকে গোটা বিশ্বব্যাপী যে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে ; শিক্ষাব্যবস্থা থেকে গোটা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নৈতিক করার ক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। সাম্প্রতিককালের খ্যাতনামা মার্কিন শিক্ষাবিদ Albert Schezer বলেন "In Progressing Socialization of man progress in spiratuality is the most important one."[১১] অথচ কুদরত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টে নৈতিক পুনরুজ্জীবনে ধর্মের প্রভাব যেমন উপেক্ষিত হয়েছে তেমনই বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের হাজার বছর ধরে লালিত বিশ্বাস, জীবনবোধ ও চেতনা অনুপস্থিত। খুদা কমিশন রিপোর্টে আদর্শিত লক্ষ্যহীন। নৈতিকতার গুরুত্ব স্বীকার করার পরও উজ্জীবনের পথ ও পাথেয় নিষিদ্ধ। এ যেন তেতুল গাছ থেকে মিষ্টি আম পাওয়ার আশা। মনীষী প্লেটোর কথা মত শিক্ষাব্যবস্থা যদি হয় Mental medicine for mental maladies তাহলে বলতে হয় খুদা কমিশন রিপোর্টে Full of mental maladies but without medicine.

চ. খুদা কমিশন রিপোর্ট ও মাদ্রাসা শিক্ষা

খুদা কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে সুকৌশলে তুলে দেয়ার সুপারিশ করেছে। প্রাথমিক রিপোর্টের ১১শ অধ্যায়ে মাত্র এক পৃষ্ঠার দায়সারা গোছের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মাদ্রাসাগুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মতো একই

www.pathagar.com

শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হবে। ধর্ম শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তরে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা একদেশদর্শী বলে সমালোচনা করে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষাদানে উষ্মা প্রকাশ করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে 'বৃত্তিমূলক' অস্তিত্ব বজায় রাখার সদয় অনুমতি দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে তাৎপর্যের ব্যাপার মাদ্রাসা শিক্ষাকে সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর টোলের সাথে সমপর্যায় বিবেচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে ৮ বছর পর মাধ্যমিক স্তরে কেবলমাত্র ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে দ্বীনিয়াত পড়ার অনুমতি দিলে মাদ্রাসা শিক্ষা আদৌ থাকে কিভাবে সঙ্গতভাবেই সে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়।

খুদা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশের আগেই শাসক এলিটদের র‍্যাডিকেল অংশ প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেবার দাবি জানায়। সে উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক নিয়োগ প্রাপ্ত সচিব মাদ্রাসা শিক্ষা নিষিদ্ধ করার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেন। মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। শিক্ষাবিদ আবুল ফজল সংবাদপত্রে দীর্ঘ নিবন্ধ লিখে সরকারকে বিরত হতে বলেন। মওলানা ভাসানী 'আগুন নিয়ে খেলা' না করার জন্য সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন। অবশেষে সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের হস্তক্ষেপে ঐ অপরিণামদর্শী প্রস্তাব বাস্তবায়ন স্থগিত করা হয়।

ছ. খুদা কমিশন রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই সরকারের একটি প্রস্তাব অনুযায়ী ড. মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা এর নেতৃত্বে ২০ সদস্য বিশিষ্ট এই শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। দু' বছর কার্যকালের পর ১৯৭৪ সালের ৩০শে মে কমিশন রিপোর্ট পেশ করে। কমিশন গঠনের ঘোষণায় বলা হয় "বর্তমান শিক্ষার নানাবিধ অভাব ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সুষ্ঠু জাতি গঠনের নির্দেশ দান এবং দেশকে আধুনিক জ্ঞান ও কর্মশক্তিতে বলিয়ান করার পথ নির্দেশের উদ্দেশ্যেই সরকার এই কমিশন নিয়োগ করেন।"[১২] কমিশনটি প্রতিনিধিত্বমূলক করার চেষ্টা করা হয়। তবে রাজনৈতিক ভিন্নমত পোষণকারী কেউই এ কমিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কমিশনের রিপোর্টের প্রথম অধ্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়। যা রিপোর্টের প্রস্তাবনা বা মৌলনীতিমালা বলে গণ্য করা যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সুনাগরিক সৃষ্টির জন্য চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের বিষয়টি স্থান পায়। এ অংশও মৌল নীতিমালার অংশ বলে ধরে নেয়া যায়। রিপোর্টের তৃতীয় অধ্যায়ে শিক্ষার্থীদের নানাভাবে কর্মমুখী করার পরামর্শ দেয়া হয়। এরপর আরও ২০টি অধ্যায়ে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা সমস্যার নানাদিক সবিস্তারে আলোচনা করা হয়। এসব অধ্যায়গুলো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষণ, উচ্চ শিক্ষা, বিজ্ঞান, কৃষি,

www.pathagar.com

চিকিৎসা, বাণিজ্য শিক্ষা, আইন ও কলা, পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ পদ্ধতি, শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য-পুস্তক, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষার পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ক। বস্তুত শিক্ষার প্রতিটি ইস্যুকে তারা স্পর্শ করার চেষ্টা করেন। অনেক ভাল ভাল নির্দেশিকা থাকলেও কতিপয় নীতিগত ও প্রায়োগিক সমস্যার কারণে ঐ সরকারের আমলেই রিপোর্ট বাস্তবায়নে সমস্যা ও অনীহার সৃষ্টি হয়।

কমিশন প্রায়োগিক সমস্যাগুলো অনুধাবন না করে অতিমাত্রায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও কল্পনাপ্রবণ হয়েছে বলে সেই সময়ে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। যেমন ঃ প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রলম্বিত করার প্রস্তাবকে অনেকেই অবাস্তব আখ্যায়িত করেন। মাধ্যমিক শিক্ষাকে সংকুচিত করা এবং উচ্চ শিক্ষাকে আরও সংকুচিত করার প্রস্তাব শিক্ষার্থী মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তবে মাতৃভাষার ব্যাপক প্রয়োগ, বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ, শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি ভাল ভাল প্রস্তাব এ রিপোর্টে স্থান পায়। পরবর্তী সরকারগুলো এই রিপোর্ট গ্রহণ না করে ড. মফিজ কমিশন ও ড. মজিদ কমিশনের মতো নতুন নতুন কমিশন নিয়োগ করে। বর্তমান সরকার নীতিগতভাবে ২১ বছর আগে প্রণীত রিপোর্ট অতিদ্রুত বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছেন।[১৩] সরকারের আরও কতিপয় সিদ্ধান্ত যেমন পাঠ্যক্রম সংস্কার ও ইসলামী শিক্ষা সংকোচনের নীতির প্রেক্ষিতে জনমনে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন করে প্রশ্ন, উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে।

জ. আজকের ইস্যু

সম্প্রতি যে কারণে বাংলাদেশের বিশ্বাসী মানুষের হৃদয় আহত হয়েছে সেটি ইসলামী শিক্ষা সংকোচনের দৃষ্টিভঙ্গি। বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথে খবর বের হয় যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার নম্বর ১০০ থেকে কমিয়ে ৫০ করা হয়েছে।[১৪] খবরটি প্রকাশিত হওয়ার পর ছাত্র, শিক্ষক, পেশাগত সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবি পর্যায়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত ধর্মপরায়ণ জনগণ এ খবরকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেননি। সভা, সমিতি, মিটিং মিছিল এর মাধ্যমে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন অব্যাহত থাকে। বিষয়টি ধর্মপ্রাণ মানুষকে স্পর্শ করছে দেখে সরকারের তরফ থেকে একটি বিবৃতি দেয়া হয়। বিবৃতিতে বলা হয়—এই সিদ্ধান্তটি পূর্ববর্তী সরকারের গৃহিত।[১৫] পূর্ববর্তী সরকার বলতে স্বাভাবিকভাবেই বিএন পি সরকারকে বোঝানোর কথা। বি এন পি এর প্রতিবাদ করে। পরে জানা যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সর্বশেষ সরকারি আদেশ দ্বারা এটি করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নীতিগত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নাগরিক সাধারণ

www.pathagar.com

সচেতন। খুব সঙ্গতভাবেই এ নীতিগত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনুকূল সংবাদ পত্রগুলো এবং বিবেকবান মানুষেরা প্রতিবাদ করছেন। কেউ কেউ বর্তমান সরকারের নেপথ্য ভূমিকার কথা বলছেন।[১৬] আবার কেউবা বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক সাধুতার প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।[১৭] গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালার সাথে তুলনা করছেন কেউ কেউ। সর্বশেষ বিবৃতিতে বলা হয় ঃ "ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ সচেতন এবং সরকার বিশ্বাস করে যে, ধর্ম মানুষের জীবনের উন্নতি ও সমাজের শৃঙ্খলার একটি প্রধান পাথেয়। অতএব ধর্মীয় শিক্ষা সবার জন্যই প্রয়োজন।[১৮] এই বিবৃতিতে জনসাধারণকে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। পরে ৫০ নম্বরের স্থলে ১০০ নম্বর পুনর্বহালের কথা বলা হয়ছে।

অপর বিরোধী বিষয়টি সত্যিকার ইতিহাস তুলে ধরার জন্য পাঠ্য-পুস্তকের সংশোধন ও সংযোজন। বিষয়টি আবেগময় ও স্পর্শকাতরভাবে পরিবেশিত হওয়ায় প্রকাশ্য ক্ষোভ সীমিত। তবে কোন কোন সংবাদপত্র এই প্রচেষ্টাকে দলীয় কৃতিত্ব জাহিরের নগ্ন প্রচেষ্টা বলে সমালোচনা করেছে।[১৯] গঠিত সংশোধনী কমিটি প্রতিনিধিত্বমূলক নয়—এ অভিযোগও এসেছে।[২০] এছাড়া এ কমিটি তার সীমা লংঘন করে পাঠ্য-পুস্তক থেকে ইসলাম ও মুসলমানের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে সচেষ্ট বলে জানা গেছে।[২১] পাঠ্য-পুস্তক এবং অন্যত্র সরকার আল্লাহ শব্দের পরিবর্তে সৃষ্টিকর্তা ব্যবহারে সচেষ্ট বলে অভিযোগ এসেছে। বিসমিল্লাহ এর ব্যাপারেও ঐ একই অভিযোগ।[২২]

ঝ. বর্তমান প্রেক্ষিত

এমন এক দুঃসহ সময় এসব অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশিত হচ্ছে যখন সামগ্রিকভাবে গোটা শিক্ষাব্যবস্থা শোচনীয় পর্যায় অতিক্রম করছে। শিক্ষাঙ্গনে বিশেষত উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্ত্রাসী তৎপরতায় বিপর্যস্ত। সরকারি ও বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষা ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণহীনতা বিরাজ করছে। ব্যাঙের ছাতার মতো অলি-গলিতে গজিয়ে ওঠছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। মাধ্যমিক স্কুলগুলো এক শ্রেণীর লোকের বিজনেস সেন্টারে পরিণত হয়েছে। কোচিং সেন্টারের ব্যবসায় জমজমাট। প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি বা পলিটেকনিক যে কোন স্পেশালাইজড প্রতিষ্ঠানে সেই স্পেশাল পরিবেশ অনুপস্থিত। সারা দেশে সর্বস্তরে শিক্ষার মান হ্রাস পেয়েছে। নকল প্রবণতা ১৯৭২-এর মতো আবার জেকে বসতে চাইছে। প্রাথমিক শিক্ষা এমনিতেই জবাবদিহিতা বিহীন অবস্থায় অত্যন্ত নাজুকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির ফলে এখন শেষ অস্তিত্বটুকুও হুমকির সম্মুখীন।[২৩]

www.pathagar.com

এই বিপর্যস্ত করুণ চিত্রের কারণ কি ? কেউ যদি এ নিয়ে গভীর গবেষণায় নিয়োজিত হয়, তাহলে সে দেখতে পাবে সবকিছুর জন্য এই নৈতিকতাবিহীন শিক্ষাব্যবস্থাই দায়ী। যে সুশিক্ষার মাধ্যমে তৈরি হয় মূল্যবোধের অনুশীলন তা এখানে অনুপস্থিত। যে বিশ্বাস ও আদর্শকে ধারণ করে শিক্ষাব্যবস্থা সৃষ্টি করে জাতিসত্তার প্রাণ ভ্রমর তা আজ তিরোহিত। শিক্ষার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রণয়ন করা হচ্ছে সর্বোচ্চ বাজেট। কিন্তু 'তলাবিহীন এই ঝুড়িতে' জমছে না কিছুই। ব্যাপক ব্যয় ও প্রসার সার্টিফিকেট সর্বস্ব শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করছে। আর শিক্ষিত সমাজেই বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে অন্যায়-অবিচার, অনিয়ম, ঘুষ-দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি এবং লোভ-লালসা ইত্যাদি। যে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের পাওয়ার কথা ছিল সুনাগরিক আর সুশৃঙ্খল সমাজ তার বদলে আমরা সময়ের সাথে দ্রুত গতিতে অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছি। বস্তুবাদী শিক্ষা আর ভোগবাদী সমাজ নীতি ও নৈতিকতার বদলে আমাদেরকে হীন স্বার্থপর ও সংকীর্ণ করে তুলছে। গোটা শিক্ষার কাঠামোতে এই বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীর চিরায়ত আদর্শ জীবনদর্শন ও মূল্যবোধ অগ্রাহ্য হওয়ার কারণে বৈষয়িক স্বার্থ চরিতার্থ করাই বিদ্যার্জনের মূল টার্গেট হয়ে পড়েছে। ফলে সমাজ বিনির্মাণের পরিবর্তে সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করেছে। সুতরাং "মূল্যবোধ ভিত্তিক ধর্মীয় অনুশাসনের আলোকে প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই।"২৪

এঃ. কতিপয় সুপারিশ

উপরোক্ত আলোচনা পর্যালোচনার ভিত্তিতে খুব সংক্ষিপ্তভাবে কিছু করণীয় নির্দেশ করা যায় ঃ

১. জাতীয় মৌলনীতি ও অনুসৃত জীবনাদর্শ অনুযায়ী সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠন করতে হবে।

২. অবিলম্বে জ্ঞানী ও বিবেচক ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে উপরোক্ত আদর্শিক কাঠামোর অধীনে শিক্ষা সংস্কারের জন্য উপযুক্ত প্রতিনিধিত্বমূলক কমিশন গঠন করতে হবে।

৩. রাষ্ট্রকে শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রচার মাধ্যমসহ সর্বত্র নৈতিক অবক্ষয় রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও প্রচার যুদ্ধ শুরু করতে হবে।

৪. শিক্ষাঙ্গনে সাময়িকভাবে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে।

৫. শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বস্তরে শিক্ষকদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সীমিত করে প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে।

www.pathagar.com

৭. শিক্ষা প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করতে হবে।

৮. মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষকতায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উচ্চ প্রারম্ভিক বেতন-ভাতা দিতে হবে।

৯. শিক্ষা উপকরণের দাম সীমিত রাখতে হবে।

১০. আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন বিলাস পরিত্যক্ত করতে হবে। এই জাতির অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে ক্রমান্বয়ে শিক্ষা সংস্কারে ব্রতী হতে হবে। ইতোপূর্বে গঠিত সকল কমিশন ও কমিটির সুপারিশ খতিয়ে দেখতে হবে।

ট. উপসংহার ঃ জাতীয় আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা নির্মাণ

"আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও চেতনা চিরকাল শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রেখে এসেছে।[২৫] এটি শুধুমাত্র একজন মানুষের প্রত্যয় নয়। এ প্রত্যয় গোটা জাতির। প্রাথমিক আলোচনায় দেখেছি আমাদের এ প্রত্যয় গ্রথিত রয়েছে এই জাতির উৎসমূলে। আমাদের জীবনদর্শনে। এমনকি আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয়। আমাদের সংবিধান, আমাদের ইতিহাস, আমাদের ঐতিহ্য, জাতীয় অনুসৃত নীতিমালা এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতি ঐ প্রত্যয়েরই প্রতিধ্বনি করে। এমনকি আমাদের এই বিশ্বাসী জাতি গোটা বিশ্ব তথা মুসলিম উম্মার কাছে বারংবার সুস্পষ্টভাবে নিজ আদর্শ ও বিশ্বাস অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[২৬]

সুতরাং জাতীয় অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি নিশ্চিতভাবেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি আদর্শিক ভিত্তি প্রদান করে। সেই ভিত্তিমূলের অনুসরণ এবং অনুশীলন আমাদেরকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। "আমাদের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, অভিজ্ঞান ও ধর্মীয় চেতনার পটভূমি স্মরণ রেখে রাজনৈতিক চিন্তা ও দলগত অভিপ্রায়"[২৭] অতিক্রম করে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার এ ব্যাপারে জাতীয় ঐকমত্যের ধারক ও বাহকে পরিণত হবেন গোটা জাতির এই কামনা। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার সংকট নিরসনকল্পে সকলের যা যা দায়িত্ব ও কর্তব্য[২৮] আছে আমরা যদি তা করি তাহলে নিশ্চয়ই অনাগত সকল প্রজন্মের কাছে একটি সুখী সুন্দর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ রেখে যেতে পারবো।

www.pathagar.com

প্রমাণপঞ্জী

১. Gabriel A. Almond, The politics of the Developing Areas. (Princeton University press. Princeton, 1960) p. 27

২. সকল বিবৃতির জন্য দেখুন, V. V. Rao. The Theory of Eduction (S, Chand, New Delli, 1972) pp 49-61.

৩. দরবেশ আলী খান, প্লেটো ও এরিষ্টটলের রাজনৈতিক চিন্তা (মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭) পৃ. ৪৪, ৪৫।

৪. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (খুদা কমিশন রিপোর্ট) ঢাকা, মে ১৯৭৪। পৃঃ ১-৪,

৫. জাতীয় সংসদে শিক্ষামন্ত্রীর ভাষণ, আজকের কাগজ, ২৫ জুলাই, ১৯৯৬।

৬. প্রাগুক্ত নং ৪ পৃঃ ২।

৭. প্রাগুক্ত নং ৪ পৃঃ ৩।

৮. অধ্যাপক গোলাম আযম, "শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা" ইসলামী শিক্ষা সংকলন (ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৮৭) পৃঃ ১০-১১।

৯. প্রাগুক্ত, নং ৪ পৃঃ ৫।

১০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭।

১১. Albert Schezer, The Teaching of Reverence for Life, (Brook, N. Y. 1995) p. 10

১২. প্রাগুক্ত নং ৪ পৃঃ ১।

১৩. প্রাগুক্ত নং ৫।

১৪. মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সরকার বিরোধী পত্র-পত্রিকায় সর্বপ্রথম এ খবর বের হয়।

১৫. দৈনিক ইত্তিফাক, ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।

১৬. দৈনিক সংগ্রাম, ৭ জুলাই ১৯৯৬।

১৭. দেখুন সৈয়দ আলী আহসানের বিবৃতি, ইনকিলাব ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।

১৮. প্রাগুক্ত, নং ১৫।

১৯. দৈনিক দিনকাল, ৯ জুলাই ১৯৯৬।

২০. প্রাগুক্ত, নং ১৭।

www.pathagar.com

২১. নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক টেক্সট বুক বোর্ড কর্মকর্তার সাথে লেখকের একান্ত সাক্ষাতকার, ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬।

২২. জামায়াত প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযমের বিবৃতি, ইত্তেফাক, ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।

২৩. প্রাথমিক শিক্ষকরা গম নিয়ে কি রকম হরিলুটে ব্যস্ত তার জন্য দেখুন বাংলাবাজার পত্রিকা, ৪-১৪ জুলাই, ১৯৯৬।

২৪. এম. সায়ফুল হক, শিক্ষাব্যবস্থা কোন অনিশ্চিত গন্তব্যে, ইনকিলাব, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬।

২৫. প্রাগুক্ত, নং ১৭।

২৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন প্রফেসর সৈয়দ আলী আশরাফের বিবৃতি, ইনকিলাব, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।

২৭. প্রাগুক্ত, নং ১৭।

২৮. অনুরূপ বিবরণের জন্য দেখুন ড. খোন্দকার কুদরত-ই-এলাহী, "আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সংকট নিরসনকল্পে যা করা দরকার," দৈনিক জনকণ্ঠ, ১ এবং ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।

www.pathagar.com

সংসদীয় রাজনীতিতে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা (১৯৫৪-৯৯)

গণতন্ত্রের জন্য পৃথিবীর এই অংশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও আন্দোলন ইতিহাসের মতোই পুরনো। আর সংসদীয় রীতি-পদ্ধতির জন্য বাংলাদেশের মানুষের সহজাত কামনা ঐ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে আষ্টেপৃষ্টে জড়িত। বলতে গেলে গণতন্ত্র আর সংসদীয় পদ্ধতি আমাদের এই মানচিত্রে সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংসদীয় রাজনীতির সফলতা ও ব্যর্থতা নিয়ে আমাদের গণতান্ত্রিক মানস উদ্বিগ্ন। রাজনীতি সচেতন মানুষ সংসদীয় রাজনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করতে আগ্রহী। আর সেই আগ্রহ থেকেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।

সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা একটি প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। ফ্যাসিবাদের উত্থান সম্পর্কে যারা জানেন তারা স্বীকার করেন যে, গণতান্ত্রিক প্রথা-পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই এর উদ্ভব। তাত্ত্বিকভাবে চরম জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল ও সন্ত্রাসমূলক প্রকাশ হচ্ছে ফ্যাসিবাদ। ১৯২২ সালে ইতালিতে এবং ১৯৩৩ সালে জার্মানীতে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ঐ উভয় দেশেই প্রাথমিক পর্যায়ে গণতান্ত্রিক দল ও মতের মাধ্যমেই মুসোলিনি এবং হিটলার যাত্রা শুরু করেন। একটি সময় ও পর্যায় পর্যন্ত তারা নির্বাচন এমনকি কোয়ালিশন করে ক্ষমতাসীন হয়। ফ্যাসিবাদী প্রবণতার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যেন তেন প্রকারে 'ছলেবলে কলেকৌশলে' রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত্ব করা। যে যাই বলুক কেন তাদের সোনার হরিণ চাই। ক্ষমতাশালী সোনার হরিণকে করায়ত্ত্ব করবার জন্য তারা বড় বড় কথা বলে অনেক অনেক স্বপ্ন দেখায়। 'জাতির উর্ধ্বে কিছু নেই' 'আমার জাতি সবার সেরা' 'এক নেতা এক দেশ' 'জাতীয় সমাজতন্ত্র' ইত্যাদি আপ্তবাক্য তারা উচ্চারণ করে। গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে দিয়ে স্বৈরাচারে উত্তরণই ফ্যাসিবাদের লক্ষ্য। বিরোধী পক্ষকে নির্মূল করবার জন্য যে কোন অজুহাতই তাদের কাছে বৈধ। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'—এ হচ্ছে ফ্যাসিবাদের মূলমন্ত্র। অত্যাচারের ষ্টিমরোলার চালিয়ে বিরোধী পক্ষকে স্তব্ধ করে দেয়ার মধ্যেই তাদের সার্থকতা। অযৌক্তিক দাবি, ভাষা বা গোত্রভিত্তিক জাতীয়তাবাদ, চরম অসহিষ্ণুতা, হিংসার বহ্নি শিখা, ধর্ম বিরোধী মনোভাব—এসব হচ্ছে তাদের অনেকগুলো গুণের কয়েকটি। বুদ্ধির বদলে বুলেট, সম্মতির বদলে সন্ত্রাস এবং নির্বাচনের নামে প্রহসনই তাদের চিরদিনের কাজ। দেশ বদলিয়েছে, সময় বদলিয়েছে কিন্তু বদলায়নি তাদের চরিত্র। সব দেশে সবকালে তারা এক ও অভিন্ন চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে

www.pathagar.com

হিটলার মুসোলিনীর ভাবশিষ্যরা যা করেছে ইউরোপে ; তাদের উত্তরসূরীরা তা করে যাচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে এবং আমাদের প্রিয় পিতৃভূমি এই বাংলাদেশে। এরা গণতন্ত্রের তথা সংসদীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে উঁচু গলার প্রবক্তা। অতীতের ইতিহাস তাই প্রমাণ করে।

সংসদীয় রাজনীতি ঃ অতীত পর্যালোচনা

সংসদীয় রাজনীতি একটি বৃটিশ উত্তরাধিকার। এতদসত্ত্বেও বৃটিশ উপনিবেশিক যুগে এর উল্লেখযোগ্য বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা উপনিবেশিক কারণেই ঘটেনি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির প্রেক্ষাপটে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশেই সংসদীয় রাজনীতি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেয়া হয়। ভারতে এ প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে সফল হয়। পাকিস্তানে সংসদীয় পদ্ধতি তথা গণতন্ত্রই সামগ্রিক-ভাবে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তান Constituent Assembly ৪৭-৫৬ সময়কালে অনেক চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে অবশেষে ১৯৫৬ সনে সংসদীয় পদ্ধতিকে গ্রহণ করে একটি শাসনতন্ত্র ঘোষণা করে। কিন্তু এর কার্যকারিতা সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই একটি সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন ঘোষিত হয়। ৪৭ থেকে ৫৮ পর্যন্ত ঐ সময় একটি কেন্দ্রীয় সংসদ (National Assembly) থাকা সত্ত্বেও সেখানে বাঙগালী প্রতিনিধিত্ব এবং অংশীদারিত্ব ছিল সীমিত। তবে ১৯৫৪ সনে এই পূর্বাঞ্চলে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হওয়ায় ৫৪-৫৮ এই সময়টা হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো এই দেশের লোকেরা আলোচিত ও আন্দোলিত হয়।

অতীতের উপর দাঁড়িয়েই যদি নির্মিত হয় বর্তমান তাহলে বলতেই হবে ভাল হোক মন্দ হোক ১৯৫৪ সনের অভিজ্ঞতা আমাদের সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক। বলতে গেলে এই অঞ্চলের মানুষের জন্য এটি একটি ভিত্তিভূমির মতো। সেই থেকে আমাদের শুরু। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল অনেক বছর। এই পয়তাল্লিশ বছরে অনেক পানি গড়িয়েছে এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে। পতাকার পরিবর্তন হয়েছে। অনেক রক্ত নদী পেরিয়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। আমরা এখন আর পশ্চিমাদের অথবা বৃটিশদের অধীন নই। তাই কথায় কথায় ওদের গালি দিয়ে দায়িত্ব এড়াবার আর সুযোগ নেই। তাই আত্মসমীক্ষার জন্য আসুন সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে অতীতের ধারাবাহিকতা নিয়ে বর্তমানকে বিশ্লেষণ করি।

৫৪-এর ঘটনাবলী ঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তথা সংসদীয় রাজনীতির প্রতি পূর্ব বাংলার মানুষের অব্যাহত দাবির মুখে মুসলিম লীগ সরকার ১৯৫৪ সনে তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে নির্বাচনের দাবি মেনে নেয়। মুসলিম লীগের

www.pathagar.com

ভরাডুবির লক্ষ্যে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলেন। আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম পার্টি ছিল যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরীক দল। ১৯৫৪ সনে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের সর্বমোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০৯। ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ফ্রন্ট পায় ২২৩টি আসন। এ অঞ্চলে কবর রচিত হয় মুসলিম লীগের। ১৯৫৪ সনের মার্চ মাস থেকে ৫৮ সনের অক্টোবর পর্যন্ত মোটামুটিভাবে সাড়ে চার বছর এই প্রাদেশিক পরিষদ কার্যকর থাকে। ক. কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ, খ. দলীয় অনৈক্য, গ. মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত অযোগ্যতা ইত্যাদি যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতার কারণ ছিল। কিন্তু যে কারণটি জাতিকে লজ্জা দিয়েছিল তা ছিল ফ্যাসিবাদী প্রবণতা। যারা ক্ষমতায় ছিলেন (অধিকাংশ সময় আওয়ামী লীগ) তারা ক্ষমতার সুবিধার্থে পরিষদ পরিচালনা করছিলেন। তারা সরকারের Making এবং Unmaking নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, জনস্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছে। দক্ষতায় টিকে থাকার জন্য প্রধান দল আওয়ামী লীগসহ সবাই ঘুষ-দুর্নীতি জুয়োচুরি মারামারি সবকিছুই করেছে। দুঃখজনক ঘটনার মাধ্যমে পরিষদের ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলীকে হত্যা করা হয় পরিষদ অভ্যন্তরে। এই লজ্জাকর ঘটনাটির জন্য সমসাময়িক বিশ্লেষকরা আওয়ামী লীগকে সবচেয়ে বেশী দায়ী করেন। যুক্তির মাধ্যমে সংসদীয় রীতিনীতির মাধ্যমে তারা স্পীকার তথা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে না পেরে শক্তির দ্বারা ঘায়েল করেছিলেন। ক্ষমতার জন্য ওতপেতে থাকা পাকিস্তানের সামরিক চক্র ঐ ঘটনাকেই তাদের হস্তক্ষেপের তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

সংসদীয় রাজনীতিতে ফ্যাসিবাদী প্রবণতার কারণে পাকিস্তানের জনগণকে আরও এক দশক সামরিক আমলাতন্ত্রের যাতাকলে নিষ্পেষিত হতে হয়েছে। ১৯৫৮-১৯৭০ সাল পর্যন্ত নামে অথবা বেনামে সামরিক আমলাতন্ত্রই পাকিস্তানের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। ১৯৬৯ সনে জনগণ নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের যে আন্দোলন করে তার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ নির্বাচনের রায়কে অস্বীকার করার ফলে সামরিকতন্ত্র শাসিত পাকিস্তান ভাঙচুর এর সম্মুখীন নয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে আবার এ দেশে সংসদীয় রাজনীতি অনুশীলনের সোনালী সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়।

গ. স্বাধীনতা পরবর্তী ঘটনাবলী

জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সাথে সঙ্গতি রেখে স্বাধীন বাংলাদেশে সংসদীয় রাজনীতির পথেই তার শুভযাত্রা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর

www.pathagar.com

রহমান পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে যে অস্থায়ী শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ঘোষণা করেন তাতে সংসদীয় ব্যবস্থাকেই কায়েম করা হয়। স্বাধীনতার বছরখানেকের মধ্যেই একটি সংবিধান রচিত হয়। রাষ্ট্রপতিকে গতানুগতিক প্রধান রেখে সংসদীয় পদ্ধতিতেই দেশ শাসিত হবে—এটাই ছিল রচিত শাসনতন্ত্রের অঙ্গীকার। 'জাতীয় সংসদ' নামে অভিহিত জাতীয় পরিষদকে 'সার্বভৌম' ঘোষণা করা হয়। মন্ত্রী পরিষদকে সম্মিলিতভাবে জাতীয় সংসদের কাছে দায়ী করা হয়। ঐ শাসনতন্ত্র মোতাবেক বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে আলাদা করা হয়। এই শাসনতন্ত্রের অধীনে ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু ঐ সংবিধান ও নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় অভিজ্ঞতা থেকে জাতি হতাশ হতে থাকে। জনগণ অবাক বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করে সমস্ত নির্বাহী এবং সাংবিধানিক ক্ষমতা একজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। "Eventually the party also became more powerful than the government and the legislative, because Sheikh Mujib identified himsetf more strongly with the party. Iftekharuzzaman and Mahbubur Rahman, Parliamentary Democracy in Bangladesh : Retrospeets and prospects. Biiss, 1991) শেখ মুজিব ছিলেন নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী, সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে আইন সভার অবিসম্বাদিত নেতা এবং আওয়ামী লীগের সভাপতি। একের ভিতর সবকিছুর এই প্রবণতা ফ্যাসিবাদী নেতৃত্বের লক্ষ্যণসমূহই তীব্রতর করে। তাছাড়া 'জাতির পিতা' হিসেবে তার কথাই ছিল আইন। এভাবে শেখ মুজিব সংসদীয় রীতিপদ্ধতি অর্থাৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (Political Institution) দ্বারা পরিচালিত না হয়ে তার ব্যক্তিগত সম্মোহনী ক্ষমতা (Charisma) দ্বারাই পরিচালিত হতেন। ফলে Three years of Parliamentary Rule in Bangladesh was essntially a personal Rule by Sheikh Mujib" (Rounaq Jahan, Bangladesh politics : problems and issues, Dhaka, 1990)

ঘ. ৭৩-এর জাতীয় সংসদ

জাতীয় সংসদের এ নির্বাচনে শাসক আওয়ামী লীগ ৩ শত আসনের ২৯২টিই দখল করে। নির্বাচন সম্পর্কে জোর-জবরদস্তি উদাহরণ ভোলার ডাক্তার আজাহারকে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে যাওয়ার অভিযোগে অপহরণ ঃ ভোট জালিয়াতি (সকল বিরোধীদলের অভিযোগ) মিডিয়া ক্যু (উদাহরণ ঃ মেজর জলিলের পরিবর্তে হরনাথ বাইনকে নির্বাচিত

www.pathagar.com

ঘোষণা) এবং অসহিষ্ণুতা (উদাহরণ ঃ ঢাকায় মেজর জলিলের ২৬ হাজার ভোটকে রাজাকারের ভোট হিসেবে ঘোষণা এবং সন্ত্রাস) ইত্যাদি অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। সবাই জানি সংসদীয় পদ্ধতিতে বিরোধীদলের অবস্থান এবং অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ৭৩-এর সংসদ ছিল এক রকম বিরোধীদল শূন্য। এরপরও যে ৮জন বিরোধী সদস্য ছিল তাদেরকে কেউ নানাভাবে হুমকি ও হয়রানির মোকাবেলা করতে হয়। একক প্রধান দলীয় কর্তৃত্ব (Single dominant party system) এবং আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাচার সংসদকে তার বাঞ্ছিত ভূমিকা থেকে বঞ্চিত করে এবং কার্যত সংসদকে আওয়ামী কর্তৃত্বের কাছে 'রাবার ষ্ট্যাম্পে' পরিণত করে।" In the last three years the parliament neither worked as a check on government nor did it mirror public opinion."(Rounaq Jahan পূর্বোক্ত) রাজনৈতিক বিরোধিতাকে ঐ সংসদ কখনওই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে 'রাজাকার' 'দুষ্কৃতকারী' 'টাউট' ইত্যাদি অসামাজিক অভিধায় অভিহিত করা হয়।

নিজেদের রচিত শাসনতন্ত্রকে যখন ইচ্ছে পরিবর্তনের নজির তারাই প্রথম সৃষ্টি করে। ৭৩ সনে দ্বিতীয় সংশোধনী আদেশের মাধ্যমে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ব্যবস্থা করা হয়। এই কুখ্যাত সংশোধনী আদেশের মাধ্যমেই স্বাধীন বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির প্রথম বিচ্যুতি ঘটে। এই আদেশে প্রতি ৬০ দিনে একবার অধিবেশন আহ্বানের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রহিত করে ১২০ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও এ সংসদ নানা ধরনের নিবর্তন-মূলক আইন ও আদেশকে অনুমোদন করে। যেমন "ডিটেনশন আদেশ" রাজনৈতিক তৎপরতা রহিতকরণ" "বিশেষ ট্রাইবুন্যাল" এবং "বিশেষ ক্ষমতা আইন" অধ্যাদেশ ইত্যাদি। সুপ্রীম কোর্ট যখন বিপুল সংখ্যক গ্রেফতারকৃত মানুষকে মুক্তি দেয় তখন এরা কোর্টের উপর ক্ষেপে যায়। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের ঐ এখতিয়ার রহিত করা হয়।

চতুর্থ সংশোধনী

স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় যে কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা (Authretarian trend) বিরাজমান ছিল ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে তা সর্বাত্মকবাদী ব্যবস্থায় (Totalitarian System) পর্যবসিত হয়। দেশ বিদেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই আমূল পরিবর্তনকে 'সাংবিধানিক অভ্যুত্থান' (Constitutional Coup) বলে অভিহিত করেছেন। (তালুকদার মনিরুজ্জামান ও ক্রাগ বাক্সটার) আওয়ামী লীগ সরকার

www.pathagar.com

সমসাময়িক বিশ্বকে বিস্মিত করে অল্প সময়ের মধ্যে কোন ধরনের বিতর্ক বা আলোচনা ছাড়াই রাষ্ট্রব্যবস্থা ঐ বৈপ্লবিক পরিবর্তনটি সাঙ্গ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই সংসদীয় পদ্ধতিকে 'ঔপনেবিশিক' 'শোষণের হাতিয়ার' ঘোষণা করে সর্বাত্মকবাদী ঐ ব্যবস্থাকে দ্বিতীয় বিপ্লব বলে অভিহিত করেন। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী পার্লামেন্টের ঐ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা, তথ্য দফতর কর্তৃক প্রকাশিত। পরিবর্তনের ফলে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা জাতির উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যান্য অঙ্গ ঃ আইন, বিচার ও নির্বাহী বিভাগের উপর সর্বাত্মক ক্ষমতার অধিকারী রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'এক নেতা এক দেশ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ' এ শ্লোগানকে লক্ষ্য ও উপায় দু' ভাগেই গ্রহণ করা হয়। তাঁকে আজীবন প্রেসিডেন্ট করার আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতিকালে তিনি নিহত হন। উল্লেখ্য যে, ১৫ আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঐ ঘোষণা প্রদানের কথা ছিল।

এই সংশোধনী পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বও কেড়ে নেয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্ব করা হয়। মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত শাসনতন্ত্রের বিধিবিধানসমূহ বহুলাংশে বাতিল করা হয়। মাত্র ৪টি সংবাদপত্র জাতীয়করণ করে আর সকল সংবাদ পত্রের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে ইত্তেফাকের ঐতিহাসিক ভূমিকা সকলের জানা কথা, মরহুম তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার স্মৃতি বিজড়িত প্রতিষ্ঠানটিও কুক্ষিগত করা হয়। মানিক মিয়া পরিবারকে পত্রিকার মালিকানা থেকে বঞ্চিত করে সেখানে নতুন প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। এদিকে আর এক ফরমান অনুযায়ী সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কেবলমাত্র আওয়ামী লীগকে বহাল রাখা হয়। দলের আগে কৃষক শ্রমিক শব্দটি যোগ করে বামপন্থী পরিশুদ্ধতা প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে বিগত সিকি শতাব্দী ধরে জাতি যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও মূল্যবোধসমূহ অর্জন করেছিল তার অবলুপ্তি ঘটে। আর এই পরিবর্তন ঘটে ক্ষুব্ধ নিরবতার মধ্যে। রাজনৈতিক দলসমূহ এর বিরোধিতা করতে ব্যর্থ হয়। তবে মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক জেনারেল ওসমানী এবং মানিক মিয়ার সুযোগ্য পুত্র ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন বিরল সাহস প্রদর্শন করেন এবং এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের গবেষণা ও বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু তার বক্তৃতায় এই ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্য বামপন্থী সন্ত্রাস তথা "মুসলিম বাংলার" শোরগোলকে দায়ী করলেও ঐ পরিবর্তনের নেপথ্য নায়ক দু'টো

www.pathagar.com

পক্ষ। (১) বাংলাদেশের তথাকথিত মিত্র পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন (২) দেশে ক্রিয়াশীল সোভিয়েত লবি। এই সোভিয়েত লবি আবার দু' ভাগে বিভক্ত করা যায়। (ক) আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ ফজলুল হক মনি, মতিয়া চক্র। (খ) এককালীন রাজনৈতিক অঙ্গনে আওয়ামী লীগের বি-টিম বলে পরিচিত মনি সিং-এর সি. পি. বি এবং অধ্যাপক মোজাফফরের ন্যাপ। মনি-মনি সিং এবং মোজাফফর এই ত্রিদলীয় ঐক্যজোট। বঙ্গবন্ধুকে সোভিয়েত পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নও রাজনৈতিক চাপ দেয়। সংসদীয় রাজনীতির পরিবর্তে তথাকথিত এই "শক্তিশালী পদ্ধতি"র (S. H. Chakravarty, Evolution of politics in Bangladesh,77) প্রবর্তন নিসন্দেহে একটি 'ফ্যাসিবাদী' প্রবণতা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এই ফ্যাসিবাদী প্রবণতার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে সংঘটিত হয় আগষ্ট অভ্যুত্থান। তার কারণ একটি বহমান নদীর স্বাভাবিক গতিকে যদি বাধ দিয়ে পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয় তাহলে এক সময় সর্বগ্রাসী প্লাবন অবধারিত। বর্তমান বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক অবলুপ্তি এবং পূর্ব ইউরোপের গণবিপ্লবসমূহ এর উদাহরণ। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে যে সংসদীয় পদ্ধতির অবলুপ্তি ঘটে তা পুনরুদ্ধার করতে জাতিকে আরো সতের বছর অপেক্ষা করতে হয়। ১৯৭৮-৮৯ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে যখন বহুদলীয় রাজনীতি আবার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রধানত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কুশলতার অভাবে জাতি সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরে পেতে ব্যর্থ হয়। (একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারে মরহুম আতাউর রহমান খান লেখককে এ অভিমত প্রদান করেন।) পরবর্তীকালে সীমিত ক্ষমতা এবং পরিধি নিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থাধীনে যে জাতীয় সংসদ গঠিত হয় তাতেও আওয়ামীলীগ যথার্থ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দল অনির্দিষ্টকালের জন্য সংসদ অধিবেশন বর্জন করে। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে হলেও এই দ্বিতীয় সংসদে সকল দল ও মতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব লক্ষ করা যায়। ৩৯ সদস্য নিয়ে আওয়ামী লীগ প্রধান বিরোধী দল এবং আরো বারোটি দল পার্লামেন্টে আসন পায়। প্রয়োজনীয় সহযোগিতার পরিবর্তে প্রধান বিরোধীদল এবং বি. এন. পি. সুমেরু কু-মেরু দূরত্বে অবস্থান করে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই পার্লামেন্টের আয়ুষ্কাল এরশাদের সামরিক অভ্যুত্থানের কারণে নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ হয়। আরো দুর্ভাগ্যজনক প্রধান বিরোধীদল দৃশ্যত এই অসাংবিধানিক ক্রিয়াকর্মকে স্বাগত জানায়। (২৫শে মার্চে '৮২ বাংলার বাণী দ্রষ্টব্য) এরপর এরশাদের বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ায় (Civilianzation process) ১৯৮৬ সালে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

সামরিক শাসনকে নির্বাচনের মাধ্যমে বৈধতা না দেয়ার ঐকমত্য থাকা সত্ত্বেও এই সামরিক স্বেচ্ছাচারীকে সহযোগিতা দিয়ে গণবিরোধী ভূমিকা পালন করে। '৮৭ সালের নভেম্বর আন্দোলনের চরম মুহূর্তেও তাদের পার্লামেন্টের গদি ছাড়ার বাসনা ত্যাগ করতে কষ্ট হয়। এরশাদীয় এই পার্লামেন্টের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলেও দেখা যাবে আওয়ামীলীগ সমসময়ই Double standard নীতি অবলম্বন করে। তারা গাছেরটা এবং তলারটা দু'টোই খেতে চায়। পার্লামেন্ট অথবা রাজপথ এ দু'টোর মধ্যে তারা কোন সুসমন্বয় নীতি অবলম্বনে ব্যর্থ হয়। তারা ঐ পার্লামেন্টেও দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থেকে সেটিকে অকার্যকর করে তোলে। অবশ্য ১৯৮৮ সালের আর একটি তথাকথিত জাতীয় সংসদ গঠিত হলে আওয়ামীলীগ অংশগ্রহণে বিরত থাকে। ১৯৯১-এর ঐতিহাসিক গণবিপ্লবের ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় জনগণের কাঙ্ক্ষিত সংসদীয় ব্যবস্থা।

পঞ্চম সংসদ ও আওয়ামীলীগ

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি বাংলাদেশের পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এ নির্বাচনের বৈধতা বা নিরপেক্ষতা নিয়ে দেশে বা বিদেশে কোন রকম টু শব্দটি হয়নি। অথচ আওয়ামী লীগ নেত্রী এর মধ্যে 'সূক্ষ্ম কারচুপি' আবিষ্কার করেন। এ মন্তব্য গণতন্ত্র বিশ্বাসী সকল মানুষকে অবাক করে। পর্যবেক্ষকরা আওয়ামী লীগ আসলেই একটি গণতান্ত্রিক শক্তি কিনা সে প্রশ্ন করার অবকাশ পান।

১৯৯১-এর ৭ই আগষ্ট মধ্যরাতের পর সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পুনঃপ্রবর্তনের জন্য সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশ করা হয়। সংসদীয় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নজিরবিহীন জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় আওয়ামীলীগ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। বলা হয় স্বাধীনতা অর্জন করা সহজ, স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা কঠিন। তদ্রূপ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সহজ কিন্তু এর কার্যকারিতা অব্যাহত রাখা কঠিন এবং অনুশীলন সাপেক্ষ। রাজনৈতিক দলগুলো যদি সংসদীয় শিষ্টাচার, রীতিনীতি এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা না করে তাহলে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য।

১৯৯১-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে গণভোটের সুস্পষ্ট রায় গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর ১৭ বছরের রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির বিলুপ্তি ঘটে। ১৯ শে সেপ্টেম্বর '৯১ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বি. এন. পি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট নতুন মন্ত্রী পরিষদ শপথ গ্রহণ করে। সংসদীয় শিষ্টাচার অনুযায়ী প্রধান বিরোধীদল সহ সকল দলীয় নেতৃবৃন্দের শপথ

www.pathagar.com

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা। কিন্তু আওয়ামী লীগ নেত্রী অথবা পক্ষ থেকে ঐ অনুষ্ঠানে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। এটা কি প্রমাণ করে না যে, আওয়ামী লীগ নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত দেখে ন্যূনতম শিষ্টাচারও ভুলে গেছে।

সংসদীয় সরকারে সাধারণত রাষ্ট্রপ্রধান জাতীয় সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। এ ক্ষেত্রে ভোটাভুটির নজির খুবই বিরল। ভারত অষ্ট্রেলিয়াও কানাডায় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সেখানে কোন বিরোধীদল কর্তৃক উক্ত পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। ১৯৯১-এর ৮ই অক্টোবর সংসদীয় রীতি পদ্ধতির অধীনে যখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রশ্ন আসে তখন আওয়ামী লীগ সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত ও অনুসরিত সংসদীয় শিষ্টাচার প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়। প্রথম পর্যায়ে তারা অন্যান্য বিরোধী দলের সাথে আলোচনা না করে বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে তাদের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়। পরবর্তীতে তাকে জাতীয় ঐকমত্যের প্রার্থী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। জামায়াত, জাতীয় পার্টি এবং ওয়ার্কার্স পার্টি এই মনোনয়নের বিরোধিতা করে। এ ক্ষেত্রে প্রথমত আওয়ামী লীগ সংসদীয় শিষ্টাচার লংঘন করে দ্বিতীয়ত সকল বিরোধীদলের সম্মতি নিয়ে নিজেকে অন্তত বিরোধী দলগুলোর কাছে নিজকে গ্রহণযোগ্য করতে ব্যর্থ হয়।

৫ম সংসদের বিভিন্ন অধিবেশনে তাদের আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করলে জাতিকে হতাশ হতে হয়। আলোচনায় অসহিষ্ণুতা, প্রতিপক্ষকে অশালীন ভাষায় গালাগাল, যুক্তির বদলে পেশীর প্রাধান্য, জুতা প্রদর্শন, ফাইল ছুঁড়ে মারা এবং তেড়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা নিসন্দেহে সংসদীয় রাজনীতি সম্পূরক নয়। অতীতের মতো এ ক্ষেত্রেও সংবাদপত্রের ভাষ্য মোতাবেক প্রধান বিরোধীদলই মূখ্য।

সংসদীয় রাজনীতির অন্যতম শর্ত হল রাজনীতিকে সংসদেই বেগবান এবং সিদ্ধান্তশীল রাখা। কিন্তু পঞ্চম সংসদের কার্যবিবরণী প্রমাণ করে তারা 'রাজপথ' এবং 'সংসদ' এর মধ্যে সীমারেখা অংকনে ব্যর্থ হয়েছেন।

পঞ্চম সংসদের পরিণতি

পঞ্চম সংসদ সার্থক পরিণতি অর্জনে ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধীদল সংসদীয় ব্যর্থতাকে সরকার পতনের আন্দোলনের রূপ দিতে সক্ষম হয়। বিরোধীদল ধীরপথ পরিহার করে খুব কম সময়ের মধ্যেই সংসদের যবনিকা তরান্বিত করে। এ লক্ষ্যে ৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধীদলের ১৪৭জন সদস্য একযোগে পদত্যাগ করেন। বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে ৫ম সংসদ ছিল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী সংসদ। চার বছর ৭ মাস ১৯

www.pathagar.com

দিন কার্যকালের পর এর অপমৃত্যু ঘটে। এর বড় ব্যর্থতা হল ২০ মাসেরও বেশী সময় এটি ছিল বিরোধী প্রতিনিধিত্ব বিহীন। বিরোধীদের পদত্যাগের সময় থেকে ৫ নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখে বিলুপ্তি পর্যন্ত বিরোধীদল ছাড়াই সংসদ পরিচালিত হয়। এ সংসদ প্রত্যাশিত ৫ বছর কার্যকাল পূরণে ব্যর্থ হয়। ৩৩০ সদস্যের এ সংসদ ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়। প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় এ সংসদ ২২টি পৃথক পৃথক অধিবেশনে ৪০০টি কার্যদিবস অতিবাহিত করে। বিরোধীদল প্রথম ১৩টি অধিবেশনে উপস্থিত ছিল। পরে তারা বর্জন ও পদত্যাগ করে।

৬ষ্ঠ সংসদ সংবাদ

বি. এন. পি সরকারের অগঠনমূলক ভূমিকা এবং বিরোধীদলের গোয়ার্তুমী ভূমিকার কারণে পঞ্চম সংসদের পতন ঘটে। বিরোধীদলের তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবির মুখে সংসদের পতন ঘটলেও ঐ সংসদের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা, বিরোধীদের অনুপস্থিতি সর্বোপরি সংবিধান সংশোধনের কারণে সম্ভব ছিল না। বি. এন. পি সরকার সুপ্রীর্ম কোর্টের কাছে 'করণীয় উপদেশ প্রার্থনা' বা অন্যবিধ কার্যব্যবস্থা গ্রহণ না করে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা প্রদর্শন করে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। বিরোধীদল এ সংসদ নির্বাচন বর্জন করে। ফলে কার্যত একদলীয়ভাবে ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি '৯৬ অনুষ্ঠিত এই 'ভোটার বিহীন নির্বাচনে' বিএনপি এককভাবে সংসদ গঠন করে। পরে সংক্ষিপ্ত অধিবেশনের মাধ্যমে বি. এন. পি তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ করে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ায়। এভাবে মাত্র তিন দিনের মাথায় এ কৃত্রিম সংসদের অবসান ঘটে।

সপ্তম সংসদের কার্যকারিতা

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে গৃহিত ১২ই জুন ১৯৯৬-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বি. এন. পি নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি সন্ত্রাস ও অনিয়মের অভিযোগ করে। জামায়াতও নির্বাচনী রায়কে ষড়যন্ত্রমূলক বলে অভিহিত করে। আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। বি. এন. পি সংসদে বিরোধী আসনে বসতে বাধ্য হয়। প্রথম দিকে সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শিত হলেও শীঘ্রই আওয়ামী লীগ স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। ২১ বছর আগে ১৯৭৫ সালে অথবা ৪৫ বছর আগে ১৯৫৪ সালে যেসব আচার-আচরণ ও প্রবণতার কারণে আওয়ামী লীগকে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা দুষ্ট বলে অভিহিত করা হতো সেইসব দাঁতগুলো আওয়ামী লীগ আবার বের করতে থাকে। মানুষ অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করে বিগত প্রায় অর্ধ শতাব্দীতেও তাদের খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি।

www.pathagar.com

সংসদের ভিতরে এবং বাহিরে উভয় ক্ষেত্রেই হতাশাব্যঞ্জক আচরণ পরিলক্ষিত হয়। সংসদে কথা বলতে না দেয়া, বক্তব্যের খণ্ডিত অথবা উদ্দেশ্যমূলক পরিবেশনা, সংসদ পরিচালনা কমিটিতে বিরোধীদের বক্তব্য গ্রহণ না করা, স্থায়ী কমিটিগুলোতে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব না দেয়া ইত্যাকার উপায়ে সংসদকে তারা অকার্যকর করে রাখে। বাইরে সভা-সমিতি এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হামলা এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থকরণের জন্য অসংখ্য মামলা দায়ের সংসদীয় রাজনীতির প্রতি আওয়ামী লীগের চিরাচরিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রতিফলিত করে। এছাড়া মন্ত্রীত্ব দিয়ে বিরোধী এম. পিদের টোপ গেলানো, ছলেবলে কলেকৌশলে সংসদীয় গ্রুপ গঠন, সংসদীয় রাজনীতিতে অপ্রচলিত তথা কার্যত 'ঐকমত্যের সরকারের নামে' যাকে খুশী মন্ত্রী বানানো ইত্যাদি অনৈতিক কাজ সংসদীয় রাজনীতির প্রতি আওয়ামী লীগের অনাস্থারই প্রমাণ। দুর্নীতি, দলীয়করণ, দমনপীড়ন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি উপনির্বাচনে কারচুপি সর্বোপরি চিরতরে ক্ষমতায় থাকার বাকশালী প্রবণতার প্রকাশ বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহকে ক্ষুব্ধ এবং তীব্র আন্দোলনমুখী করে তুলেছে। যে কায়দায় যে রণকৌশলে আওয়ামী লীগ বিএনপিকে পূর্বে ঘায়েল করেছে এখন একই কায়দায় বি. এন. পি আওয়ামী লীগকে ঘায়েল করার জন্য মাঠে নেমেছে।

উপসংহার

একটি সফল সংসদ সমাজের আয়না স্বরূপ। বিশেষত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদ হবে সমস্ত কার্যক্রমের কেন্দ্রস্থল। বাংলাদেশের তিনটি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ১৯৭৩, ১৯৯১, ১৯৯৬ এই প্রত্যয়ন অনুপস্থিত ছিল। সরকার ও বিরোধীদল এসব সংসদকে জাতির দিকনির্দেশনা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারি দলের দায়িত্ব বরং সমধিক। অপ্রিয় সত্য এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রাবল্যে সরকারি দল ফ্যাসিবাদী প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং হচ্ছে। সরকারি দল মনে করে তারাই একমাত্র দেশ প্রেমিক। একমাত্র তারাই জাতির কল্যাণকামী। সুতরাং তাদেরই কথা বলার অধিকার রয়েছে। এতুদ্দেশ্যে সংসদকে বেআইনী অনৈতিক এবং কূটিলভাবে পরিচালনার উদাহরণ রয়েছে। সংসদে জাতির মৌল বিষয়সমূহ উপেক্ষিত হয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলন, অতীত বিদ্বেষ এবং কূটিল ষড়যন্ত্র প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে এই সংসদের কার্যকারিতা বিষয়ে একটি গবেষণা সমীক্ষা পরিচালিত হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংসদীয় রাজনীতি বিশেষজ্ঞ মিস জে এন লিণ্ডে এশিয়া ফাউণ্ডেশনের সহযোগিতায় এ গবেষণা সমাপ্ত করেন। সাফল্য ব্যর্থতার খতিয়ান শেষে সংসদীয় ব্যবস্থাকে আরও

www.pathagar.com

কার্যকর আরও অর্থবহ করার ব্যাপারে লিণ্ডে ৮ দফা সুপারিশ করেন। তার সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. সংসদীয় আচরণ বিধি তৈরি অনুমোদন ও অনুসরণ
২. সংসদ সদস্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
৩. আমলাতন্ত্রকে নিজেদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা সীমিত রাখা
৪. কমিটি ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস
৫. সংসদ কার্যবিবরণী যথার্থ সংরক্ষণ প্রকাশনা ও ব্যাপক প্রচার
৬. অধিবেশন ও কার্যকালে সময়ানুবর্তিতা
৭. সংসদ সদস্যদের জন্য আইনগত পরামর্শ সার্ভিস চালু করা
৮. সংসদে সমৃদ্ধ তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও লাইব্রেরী সম্প্রসারণ।

এসব সুপারিশের পরেও আমার ব্যক্তিগত সুপারিশ নিম্নরূপ ঃ

ক. সংসদীয় রাজনীতিকে ক্ষমতা আরোহণের সিঁড়ি মনে না করে মানুষের সেবার মহান বাহন হিসেবে মনে করতে হবে।

খ. সরকার ও সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে শাসনতন্ত্রের প্রতি অকুণ্ঠভাবে অনুগত হতে হবে। অর্থাৎ Constitutionalism কায়েম করতে হবে। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পথ অনুসরণ করতে হবে।

গ. রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সৎ, যোগ্য এবং ত্যাগী হতে হবে।

ঘ. সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনে সত্যিকার সুস্থ এবং গতিশীল বহুদলীয় পদ্ধতির বিকাশ হতে হবে।

ঙ. জাতীয় সংসদ সদস্যদের আচার-আচরণে আরো দায়িত্বশীল ও সংযত হতে হবে।

চ. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে হবে।

ছ. বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিভক্ত করতে হবে।

জ. নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রতি অনুগত প্রফেশনাল আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীর বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে।

ঝ. জাতীয় প্রধান সমস্যা ও নীতিগত প্রশ্নে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে ফ্যাসিবাদী প্রবণতা দূর হবে এবং সত্যিকার সংসদীয় রাজনীতি কায়েম হবে।

www.pathagar.com

প্রধান কার্যালয় ঃ	বিক্রয় কেন্দ্র ঃ	
আধুনিক প্রকাশনী ২৫, শিরিশদাস লেন বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন ঃ ২৩৫১৯১	❑ ৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার, ওয়ারলেস রেল গেট, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২	❑ ৪৩ দেওয়ানজী পুকুর লেন দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।
	❑ ১০ আদর্শ পুস্তক বিপনী বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।	❑ ৫৫ খানজাহান আলী রোড, তারের পুকুর, খুলনা।

www.pathagar.com